অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাসযাত্রা

বাসযাত্রা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা ৭০০০০৯

ISBN : 978-81-8437-088-1

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১১

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

শব্দগ্রন্থন :
রেজ ডট কম
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :
শিবদুর্গা প্রেস
৩০বি, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা- ৭০০ ০০৬

মূল্য : আশি টাকা

ঔপন্যাসিক

সোহারাব হোসেন

প্রীতিভাজনেষু

এক

প্রায় দেড়মাস পর মিহির হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। সে তার জীবন ফিরে পেয়ে যার মুখ মনে করতে পেরেছিল—তার নাম সুহাসিনী। সে যে আবার দেশের বাড়িতে যেতে পারবে! দেশ থেকে মহাদেবদা, নীহার এসে বসে আছে—মা-বাবাও দেখতে এসেছিলেন। মা খুব কান্নাকাটি করেছেন— বিদেশ বিভুঁইয়ে মিহিরের মতো ছেলের আসা উচিত হয়নি, নার্সরা প্রবোধ দিয়েছে—চোখ মেলে যখন তাকিয়েছে, আর ভয় নেই। সাতদিনের উপর সে সংজ্ঞাহীন ছিল এবং ভোররাতের দিকে তার জ্ঞান ফিরে আসে। সে চোখ মেলে তাকায়। ভিজিটিং আওয়ারে রঙ্গন রবি চারটে বাজলেই চলে আসত। পিসিমা, টুটি-ফুটি কেউ বাদ ছিল না। এমনকী দেশ থেকে অঘোর জ্যাঠাও এসে দেখে গিয়েছেন, যিশুদাও বাদ যায়নি। খবর পেয়ে অনু তনুও এসেছিল তাকে দেখতে। সে শেষ পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করবে কি না—কারণ মাথায় চোট, এত উঁচু থেকে সিঁড়ির ধাপে আবছা অন্ধকারে পা ফেলতে গিয়েই এই কেলেঙ্কারি।

রক্ষা তার মেসবাড়ি থেকে এই হাসপাতাল বেশি দূরে নয়। সোজা ইমারজেন্সি, মেসের সবাই দল বেঁধে চলে এসেছিল, এবং যিশুদা এসে ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং যিশুদা কাগজের লোক, এবং বাঙালির খুবই প্রিয় লেখক, তার এই আসা-যাওয়ায় চিকিৎসার গুরুত্ব বেড়ে গেছে। একটি ছোট্ট কেবিনেরও ব্যবস্থা করে গেছেন তিনি।

এই মহানগরীতে সে একা চলে এসেছিল। পিসির বাড়ি থেকে কলেজে যেত, আর কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় প্রুফ দেখে বেড়াত তার নিজের খরচের জন্য—সবই ঠিকঠাক চলছিল, কেবল কখনও তার মনে হত পিসির গলগ্রহ হয়ে আছে সে—এবং রঙ্গনের সঙ্গে একটা লিটিল ম্যাগ-এ যুক্ত হয়ে, পড়তেই কফিহাউস এবং বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছিল। আর যিশুদা তার কাগজের পাতায় গল্প প্রবন্ধের প্রুফ দেখার বিষয়ে মিহিরের উপরই বেশি নির্ভর করতেন। অবশ্য সবই হয়েছে 'গণরাজ' পত্রিকার দৌলতে। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের মুখপত্র 'গণরাজ' পত্রিকার সে একসময় ছিল প্রেসবয়। তার

একটি প্রিয় সাইকেলও ছিল—সেই ভাঙা সাইকেলে সে তার কলোনি থেকে টো-টো করে ঘুরতে ভালোবাসত। মর্নিং কলেজের ক্লাস শেষে সে চলে আসত খাগড়ার প্রেসে। করাতিদা হাতে ধরে তাকে কাজ শিখিয়েছেন। লে-আউট থেকে, খবর নির্বাচন বলতে গেলে তাকেই করতে হত। করাতিদাই প্রুফ দেখা থেকে অভিধান ঘাঁটাঘাঁটির নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। করাতিদা বলতেন, গরিব বাবার ছেলে তুই। বসে থাকিস না, যত খাটবি তত শিখবি, কংগ্রেস অফিস থেকে অবশ্য সামান্য হাতখরচ বাবদ সে টাকাও পেত।

কামশাস্ত্রে বর্ণিত চারপ্রকারের নায়িকা বা স্ত্রীজাতির অন্যতমা সুহাসিনীকে মিহির তার চৈতন্য লুপ্ত হওয়ার মুহূর্তে এবং পরে জীবন ফিরে পাওয়ায় কেবলই মনে হয়েছে, তার কিছু হলে সুহাসিনীর বিষণ্ণতা বাড়ায়। সুহাসিনীর কোনও খবর না পাওয়া পর্যন্ত সে স্বস্তি বোধ করতে পারছে না। দেশ থেকে আসার সময় বলেও এসেছিল, কলকাতায় গিয়ে আমার নতুন ঠিকানা দিয়ে তোমাকে চিঠি দেব। তা আর দেওয়া হয়নি। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে জীবন এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।

কারণ সে জানে দু-তিন মাসের মধ্যেই সুহাসিনী টের পাবে জরায়ুতে কিছু তার বাসা বেঁধেছে কি না।

চিঠি লিখে জানাবারও উপায় নেই সুহাসিনীর।

কারণ সে প্রায় বিনা নোটিশেই পিসির বাসা ছেড়ে মেসে এসে উঠেছে। পিসির বাসায় সুহাসিনী তার শারীরিক অবস্থার কথা কিছুতেই জানাতে সাহস পাবে না। তাহলে এমন একটা কলঙ্কজনক ঘটনা রটনা হতে সময় লাগবে না। শত হলেও সুহাসিনী তার বাবার আশ্রিতা। ওদুদকাকা সুহাসিনীর বাবা-মাকে খুঁজে পেয়েছেন, একসময় সে ওদুদকাকার মসজিদে আশ্রয় না পেলে, ওদুদকাকারও দায় থাকত না তাকে নিয়ে এ-পাড়ে হিন্দুস্থানে এসে ওঠার।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জেরে মানুষ যে কত অসহায় সুহাসিনীকে না দেখলে বোঝা যায় না। রাইপুরা গ্রামটি সেই সুবাদে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল—কালীবাড়ির মেলায় দাঙ্গার সূত্রপাত। অবশ্য সে সব ঘটনা আজ অতীত কথা।

আসলে মাথার মধ্যে মিহিরের এখনও যে গোলমাল আছে এবং সে সব স্থিরভাবে ভাবতে পারে না, স্থিরভাবে ভাবতে পারে না বলেই ডাক্তারবাবুদের পরামর্শমতো তাকে দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অবশ্য মিহির মনে করে তার কিছুই হয়নি। সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছে।

মহাদেবদা এবং নীহার কাল ভিজিটিং আওয়ারে এসে বেশি কথাও বলেনি, হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে যাওয়ায় মহাদেবদার সঙ্গেই দেশের বাড়িতে চলে যাবে।

সে কথা বলেছে নীহারের সঙ্গে। দুটি একটি কথা।

কিন্তু মহাদেবদা কেন যে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, দেশে তো যাচ্ছেনই, সবই দেখতে পাবেন। আপনার কোনও কারণে উত্তেজনা হলে শরীরের অমঙ্গল হবে। বাড়ির সবাই ভালো আছে—দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

মিহির তো জানতে চায়, সুহাসিনী কেমন আছে। জানতে চাইলেই যে হয় না, প্রকাশ করার সংকোচ, অর্থাৎ সুহাসিনী প্রায় সমবয়সি, বেশি আগ্রহ সুহাসিনী সম্পর্কে ভালো দেখায় না—এই সব কারণে সে সুহাসিনীর কথা প্রায় এড়িয়েই গেছে। সুহাসিনী সম্পর্কে কোনও দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায়।

নীহার আজ সকালেই এসে গেছে। মহাদেবদা নীচে কোথাও আছে। কাউন্টারে এ-সময় লাইন পড়ে। হাসপাতালের টাকা-পয়সা মিটিয়ে উপরে উঠে আসবেন তিনি। হাসপাতালের এই মেডিসিন ওয়ার্ডের চারতলার করিডোরে সার সার কেবিন, তার পেছনেই একটা বিশাল হলঘর। সেখানে নানা কিসিমের রুগি। হলঘরের ভিতর দিয়ে এদিকের করিডোরে ঢুকতে হয়। নীহার চুপচাপ বসে আছে। সে কোনও প্রশ্ন না করলে উত্তর দিচ্ছে না।

অসুস্থতা থেকে নিরাময় হয়ে উঠলে প্রিয়জনের মুখ বড়ই মধুর আগ্রহ তৈরি করে।

ছোট ভাইটি তার অপেক্ষায় আছে, কতক্ষণে দাদাকে নিয়ে লালগোলা এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে যাবে। এত বড় দুর্ঘটনা সম্পর্কে কারও জানতে বাকি নেই, মেসবাড়ির সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে এই দুর্ঘটনা। বারান্দার ষাট পাওয়ারের আলোতে সিঁড়ির ধাপগুলো ঠিক স্পষ্ট নয়। তবে কোনও বোর্ডার নামতে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়নি। তার কপালেই শেষ পর্যন্ত এই দুর্ভোগ।

নীহারকে দেখে সব মনে পড়ছিল। দেশ থেকে এবারে এসে, কাউকে একটা চিঠি পর্যন্ত দেয়নি মিহির। কারণ তার ভিতরে নির্যাতনের শেষ ছিল না। সুহাসিনী শেষে তার জন্য এতটা পাগল হয়ে থাকবে, তার ঘরটায় যখন তখন ঢুকে যেত সুহাসিনী, বাড়ির শেষ দিকটায় তার ঘর, দরজা খোলাই থাকত, সুহাসিনী শেষে এত বেসামাল হয়ে পড়বে সে ভাবতেই পারেনি।

কাজেই সে সুহাসিনীকে বলে এসেছিল, চিঠি দেবে। যা হবার হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তা করবে না। আমি তো আছি। মেসের ঠিকানা সে সুহাসিনীকে দিতে পারেনি।

এই দুর্ঘটনার অন্তরালে আরও কিছু কারণ আছে, কেউ জানেই না মিহির সোমনাথদার ঈশ্বর আছেন বিষয়টাতে মত দিতে পারেনি। মিহির তার বাবার ঈশ্বর বিশ্বাসেও সায় দিতে পারেনি—সোমনাথদা আর তার বাবার এই বিশ্বাসকে গুরুত্ব না দেওয়ায় পাপ পুণ্যের সংকটে ভুগছে সে। এটা এক ধরনের অবিশ্বাসের ফল অথবা বলা যায় তার পাপের ফল—এমনও মনে হয়েছে তার। বাবার সেই সব কথা—সংক্ষেপে বলছি শোনো—মিহিরকে শুনিয়ে-শুনিয়ে যেন বলা, হে বিপ্র বিষ্ণুর মূর্তিস্বরূপ যে জল তার থেকেই, এই পর্বত সমুদ্র প্রভৃতি সংযুক্ত পদ্মপুষ্পাকৃতি বসুধরার সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই সকল জোতিষ্ক, সকল ভুবন, সকল বনপর্বত, সকল দিক সকল সমুদ্র ও সকল নদী। সকালে তার পিতার এই ধর্মপাঠের সময় কাছে থাকে না মিহির। কোনও কারণে কাছে থাকলে সে খেপে গিয়ে বলত, আসলে বাবা সব কচু!

বাবা পুঁথিপাঠ বন্ধ করে চিৎকার করে উঠতেন—কী বললে! তুমি এত বড় ম্লেচ্ছ—তোমার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়েছে। তুমি অকাল কুষ্মাণ্ড। তোমার পাপের শেষ নাই।

বাবার পুঁথিপাঠের আসরে তখন বিঘ্ন দেখা দিত। যাঁরা উঠোনে আগ্রহভরে হাতে ফুল বেলপাতা নিয়ে শুনছে তাঁরা সমস্বরে বলত, আপনি ঠাকুরবাবা ওর কথা ধরবেন না। ও তো ওরকমেরই—

বাবা তাকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করতেন।

তুমি অজ্ঞ মূর্খ।

তুমি অর্বাচীন। নিজের ধর্মকে অসম্মান করতে তোমার বাধে না। তুমি পাপি।

এইসব কথা তার সয়ে গেছে। কিন্তু এবারে যা হল—জীবন নিয়ে টানাটানি।

নীহার দাদার দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় দাদাটা তার বোকা।

দেশে তো ভালোই ছিল। করাতিদার প্রেসে কাজ করত। মর্নিং কলেজ এবং টিউশানও মন্দ ছিল না। কংগ্রেস অফিসের সনজুদিই তার মাথাটি খেয়েছে।

. নদীর তীরে সনজুদিই দাদাকে প্রথম সাইকেল চড়া শেখায়। কংগ্রেস অফিসের একতলায় তারা থাকত। কী সুন্দর দেখতে সনজুদি। বাড়ির অমতে দাদার জন্য সনজুদিও কম পাগল ছিল না। সনজুদির বাবা-মা দাদাকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। গিরিজাশংকর সনজুদির দাদু—শহরে সনজুদির দাদুর খুবই

নামডাক। ঠুংরি গজল খেয়াল সব সুরেই তার পাণ্ডিত্য অশেষ। সকাল বেলায় জানালার দারে সনজুদি যখন গলা সাধতে বসত, তখন সে দাদাকে দেখেছে রেলিঙে ভর করে পালিয়ে গান শুনছে।

সনজুদিকে তখন সেতার কোলে একেবারে সরস্বতী ঠাকরুন মনে হত।

নদীর পাড়ে সাইকেল চড়া শিখতে গিয়েই দাদা ধরা পড়ে গেল। পারিবারিক মর্যাদা বলে কথা। একজন কলোনির যুবক সনজুদির প্রেমিক হতে পারে না। পরিবারটি আত্মরক্ষার্থেই সনজুদিকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলে দাদা পড়ে গেল মহাফাঁপরে। তার খেতে ইচ্ছে হয় না, সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। কংগ্রেস অফিসে যায় না। কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাবা একদিন বললেন, কী হয়েছে তোমার?

ভাবছি কলকাতায় চলে যাব। পিসি তো লিখেছে ওখানে থেকে সুরেন্দ্রনাথে ভর্তি হতে। কলোনির জঙ্গলে পড়ে থাকলে আমার কিছু হবে না বাবা।

বাবা তো বুঝতে পারতেন সনজুদির সঙ্গে দাদার মনও কলকাতায় উড়ে গেছে।

তিনি বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন, যা ভালো বোঝো কর। বড় হয়েছ, পাখা গজিয়েছে, আমরা আর কে?

নীহার কেন যে বলল, সনজুদির সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

না।

সনজুদি তোর কাছে আসে না? বাবার কাছ থেকে সনজুদি তোর ঠিকানাও তো নিয়ে এসেছে। তুই কাগজে আছিস, তোর নাকি রোববারের পাতায় গল্প বের হয়েছে। সনজুদি বলল, মেসোমশাই দারুণ গল্প। পড়েননি।

নীহার জানে লেখালিখির বিষয়ে বাবার কোনও আগ্রহ নেই।

হ্যাঁ, পড়াশোনা বাদ দিয়ে এইসবই করুক। এতেই তার রাজ্য উদ্ধার হবে।

সনজুদি কলকাতা থেকে দেশের বাড়িতে এলে তার দাদার খোঁজে একবার আসবেই। দাদার খোঁজে পিসির বাড়িতেই গিয়েছিল, হিরন্ময়ী পিসি ধিঙ্গি মেয়ে দেখলেই খেপে যেত। মিহির ছেলেমানুষ, তাকে কেন এই সব ধিঙ্গি মেয়েরা খুঁজবে। এত সাহস হয় কী করে! মেয়েগুলোর লাজলজ্জাও নেই! অনু তনু এলেই পিসি খেপে যেত। দাদার ঠিকানা দিত না। নীলিমা সনজু, পিসির বাড়িতে গেছে, তার ভাইপো এই সব মেয়েদের পাল্লায় পড়ে নষ্ট না হয়ে যায়, কখনও কখনও বিরক্ত হয়ে পিসি বলে দিত মেয়ে তোমাদের তো বয়সের গাছপাথর নেই। তাকে কেন তোমরা খুঁজছ। শহরে কি পুরুষের অভাব?

মিহির অকপটে পিসির এই আচরণের কথা খোলাখুলি জানিয়েছে নীহারকে।

পিসিকে নিয়ে যত মুশকিল, মেসে উঠে যাব ভাবছি।

সুহাসিনীকে নিয়ে ওদুদকাকা তাদের বাড়িতে উঠে এলে দাদার মাথার পোকা কিছুটা লঘু হতে থাকে। দাদা কলকাতা থেকে ফিরে সুহাসিনীদিকে দেখে, খুবই তাজ্জব। মেয়েরা এত ভক্তিমতী হয়! এত সুন্দর হয়!

পিসিরও দোষ দেওয়া যায় না।

দাদা যে তার কলেজে পড়ে, আর ছোট নেই, দু-একজন মেয়ে বন্ধু থাকতেই পারে, কলকাতায়ও দু-একজন জুটে যেতে পারে, সনজুদি আগেই কলকাতায় চলে এসেছে, নীলিমাদিও আসতে পারে—এঁদের কাউকেই পিসি চিনতেন না। দাদা পিসির বাসায় চলে এলে, এই সব মেয়ে বন্ধুদের পিসি ধুমসো মেয়ে ভাবতেই পারে। একজন পুরুষের গন্ধে গন্ধে মেয়েরা তো ভিড় করবেই।

সে যাই হোক তখনই নীহার দেখল হাসপাতালের করিডোর ধরে সোমনাথদা আসছেন।

অবশ্য বাপের বয়সি মানুষটাকে সোমনাথদা বলতে তার লজ্জা হয়। তবে মেসের রঙ্গন এবং অন্য সবাই তাঁকে সোমনাথদা বলেই ডাকে। সেও তাঁর সোমনাথকে সোমনাথদা বলেই ডাকত।

মিহির বলল, রাতে কোথায় তোরা থাকলি? আমার ঘরে তো একটা তক্তপোশ। একজন শুতে পারবে, মহাদেবদা কোথায় গেল?

আমি সোমনাথদার ঘরেই শুয়েছি।

জায়গা কোথায়! সারা ঘরে তো তার বই-এর র‍্যাক ভর্তি।

পাশের একটা ঘরে।

সেটা তো তার পূজার ঘর। সেখানে তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, তাঁর দেবতাদের ছবি টাঙানো শুনেছি। কাউকে ঢুকতে দেন না। দরজা বন্ধ করে পূজা আহ্নিক করেন। তোকে শুতে দিল!

সোমনাথদা ঢুকে যাচ্ছে।

ওই তো মিহিরবাবু, বেশ তো খাসা আছ দেখছি।

মিহিরের সামান্য সংকোচ থাকার কথা। সে আর রঙ্গন সোমনাথদার ঠাকুর দেবতা নিয়ে মজা করতে ভালোবাসে, মাঝে মাঝে উপহাসের পর্যায়ে উঠে যায়। তিনি সাধারণত রাগ করেন না, একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে সেটা বোধ

হয় শোভাও পায় না। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পক্ষে যেটুকু গাম্ভীর্য মানায়, তার বেশি নয়। তবু তিনি মিহির এবং রঙ্গনকে পছন্দ করেন। কারণ অবিবাহিত এই মানুষটি সময় পেলেই তাদের সঙ্গ দেন। বিদেশি জার্নালে যে লেখাটেখা তার গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়—মিহির রঙ্গনকে তাও তিনি দেখিয়েছেন।

মিহির বলল, বসুন দাদা। সে নিজে একটু পাশে সরে বসলে তিনি বললেন, কটার ট্রেন ধরবে? মহাদেবদা জানেন।

সোমনাথ বললেন, মেস থেকে খেয়ে বের হও। ট্রেনে যাবে। কোনও ট্রেনই সময়মতো পৌঁছায় না। পাঁচ সাত ঘণ্টা ট্রেনে থাকবে। পেটে সলিড কিছু পড়া দরকার। কোনও দুর্বলতা বোধ করছ না তো!

আজ্ঞে না।

তিন তলায় উঠতে পারবে তো!

পারব।

সবাই অপেক্ষা করছে। যাবার সময় দেখা হয়ে গেলে তারা খুশি হবে। আমি নীচে যাচ্ছি। কাউন্টারে ঠিক মহাদেবদাকে পেয়ে যাব।

দুই

তিনতলার তাদের ঘরটা নিরিবিলিই বলা যায়। মেসের এই ঘরটাতেও বেশি রাতে আলো জ্বালা থাকে। কলেজের পড়াশোনা, লিটল ম্যাগের মেলা কাজ এবং টেবিলে থরে থরে সাজানো প্রুফের বাণ্ডিল দেখলেই বোঝা যায় কেন রঙ্গন এবং মিহির এত রাত জেগে কাজ করে।

কাজের একঘেয়েমি থেকে আত্মরক্ষার জন্যই যেন কেউ ঢুকে গেলে তারা খুশিই হয়।

সময় পেলেই সোমনাথদা ঘরে ঢুকে যান। এলে সহজে উঠতে চান না। মেসের বুবুদাই তাদের সঙ্গে সোমনাথদার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

মানুষটা কিছুটা দীর্ঘকায়।

কিছুটা আবার পাগলাটে।

লম্বা ডোরাকাটা পাতলুন আর পাঞ্জাবি গায়ে সিগারেট ধরিয়ে ঘরে ঢোকেন। গুনে গুনে দুটো সিগারেট আলাদা আনেন। চেয়ার টেনে বসার সময় দু-দিকের দুটো তক্তপোশে সিগারেট ছুঁড়ে দিলেই মিহির টের পায় তিনি আবার

মেজাজে আছেন। চা আনার জন্য হুকুম হল বলে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক শুরু হল বলে।

সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবার আগের ঘটনা—সেই এক ঈশ্বর তর্কের জের হয়তো।

পদার্থবিজ্ঞানের এই অধ্যাপক মানুষটির নিয়মের এত বাছবিচার যে কে বলবে তিনি প্রকৃতই বিজ্ঞানের উপাসক। ভাঁড় ছাড়া চা খাবেন না, কলাপাতায় ভাত খাবেন। মামা চা আনলে খাবেন।

অন্য কেউ আনলে চা খাবেন না তিনি। কারণ মামা একজন সদ্‌বংশ জাত এবং কুলীন ব্রাহ্মণ। বেটেখাটো মামা মানুষটি, মাথা প্রায় সময়ই ন্যাড়া করে রাখে। বোর্ডারদের সুখ সুবিধে দেখে—কার কী প্রয়োজন জেনে নেয়, এই করেই সে সারাদিন একতলা দুতলা তিনতলা করে বেড়ায়। মামাকে নাগালে পাওয়া প্রায় সময়ই খুব কঠিন হয়। হাফ হাতা গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট ছাড়া সে কিছু পরেও না। ওর স্ত্রী সুলক্ষণা প্রকৃতই সুন্দরী হবে এমন এক কল্পনাতেও সোমনাথদা ডুবে থাকেন।

ব্যাচেলার মানুষ সোমনাথদা—কোনও পিছুটান নেই, মামাকে তিনি কেষ্টঠাকুর ভেবে থাকেন, এই জগৎসংসারের যিনি নিয়ামক, তিনি কোনও অভিশাপে এই মেসে মামা সেজে বসে আছেন, এমন কোনও প্রত্যয় থাকতে পারে, মামাকে দিয়ে তিনি চা সিগারেট কিছুই আনান না। তার ফুট ফরমাস তাঁর ছাত্রেরাই করে দেয়। ললিতা মেয়েটা ইদানীং কোচিং নিচ্ছে। আর সব ছাত্রছাত্রী যারাই আসুক, তারা সবিনয়ে সব করে যেতে প্রস্তুত। কারণ কোচিং-এর জন্য তিনি কোনও অর্থ নেন না।

বিপদে আপদে সোমনাথদা সবারই খুব সহায়। অনেককে অর্থ দিয়েও সাহায্য করেন। তবে সবই গোপনে।

এবং সোমনাথদা তেতলার এই নিরিবিলি ঘরটাতে ঢোকার আগেই তারা টের পায় তিনি আসছেন—

তাঁর কণ্ঠ থেকে কবিতার বাণী—মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে, আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ম.... যে—এই যে বাবুরা তোমরা আছ দেখছি।

তখনই রঙ্গন বলবে, কী জপতপ সারা হল?

জপতপ নয় হে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা বুঝবে না। মিহিরবাবুর খবর কী! হাতে চিঠি পেলে? কবে থেকেই শুনছি, হয়ে যাবে।

হয়ে যাবে, হচ্ছে কোথায়! দেড় দুমাস হয়ে গেল! আরে হাতে এই চিঠিটি না পেলে যে সব মিথ্যে হয়ে যায়। সবই পূর্ব নির্দিষ্ট, তুমি পাবার কে? যিনি দেবেন তার ইচ্ছেই শেষ কথা। বুঝলে!

রঙ্গন কিছুটা রসিকতা করার জন্যই যেন বলেছিল জপতপে বসে একবার দেখবেন তো মিহির কবে চিঠিটা হাতে পাবে? আপনি তো চোখ বুজলেই সব টের পান।

মিহির দেশলাই খুঁজছিল, সিগারেট ধরাবে। রঙ্গনের এই সব মজা তার আদৌ পছন্দ নয়।

সে বাধাও দিয়েছিল, তুই কীরে। আবার সোমনাথদার পেছনে লাগলি?

না দাদা, কিছু মনে করবেন না। আজ যিশুদাই চিঠিটা দিয়েছে। বলব বলব করে আর বলা হয়নি।

তিনি বলেছিলেন, বল কী! তার মানে তোমার চাকরি পাকা! এত বড় কাগজে তোমার স্থায়ী কাজ সত্যি হয়ে গেল! আমাকে খবরটা আগে দেবে তো! কতবড় খবর! তুমি কী হে!

সোমনাথদা যেন খবরটা না দেওয়ায় কিছুটা ক্ষুব্ধ। তিনতলার মুখে তাঁর ঘরটাই প্রথম। মিহির জানে তাকে তিনি একটু আলাদা চোখেই দেখেন। তার কিছু ভালো হলে তিনি প্রকৃতই খুশি হন। এত বড় একটা খবর তাঁকে না জানিয়ে সে তার ঘরে ঢুকবে এটা তিনি ভাবতেই পারেন না।

ঘর তো নয়, বরং ঘর না বলে কাগজপত্রের ডাঁই-এর মধ্যে কোনওরকমে পোকামাকড়ের মতো নিজের বসবাসের জায়গা করে নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীরা কোচিং-এর সময় মাদুর পেতে বারান্দায়ই বসে। তিনি পদ্মাসনে বসে থাকেন। যার যা জিজ্ঞাস্য প্রায় চোখ বুজেই বলে দেন। আর আছে পায়াভাঙা একটি তক্তপোশ, কুলুঙ্গিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ফটো। তার পরের ঘরে কী আছে, কেউ জানে না। জপতপের সময় দরজা বন্ধ করে দেন।

ঘরের চারপাশে ডাঁই করা পৃথিবীর সব দুর্মূল্য পেপার কাটিং এবং এইসবই তাঁর অমূল্য সম্পদ।

তা ছাড়া তাঁর পুঁজি বলতে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু (দুর্মূল্য) বই কিছু মাসিক পত্রিকা, বাইরে থেকেও নানা প্রকারের বিজ্ঞান সংক্রান্ত জার্নাল আমদানি করার হবি আছে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাঁকে সবসময় এক রহস্যময় পৃথিবীর বাসিন্দা করে রেখেছে। তাঁর বিশ্বাস তিনিই একমাত্র গুরুর গুরু মহাগুরু আলবার্ট আইনস্টাইনের

প্রকৃত বিজ্ঞান পিপাসু ছাত্র। যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার শেষ ঈশ্বরের আশ্চর্য মহানলীলা সেখান থেকেই শুরু।

বুঝলে মিহির, এই বলে তিনি কথা আরম্ভ করেন—

বুঝলে রঙ্গন, সে এক স্বপ্ন দেখেছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন।

কী স্বপ্ন দাদা—রঙ্গনের ঠোঁটে কৌতুক।

কৌতুক থাকা ভালো, কৌতূহল থাকা আরও ভালো রঙ্গন, কৌতূহল আছে বলে বিজ্ঞান মানবসভ্যতার এত দূরে এসে পৌঁছেছে। বিনয়ী নম্র মানুষটি কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে জানেন না।

রঙ্গন বলেছিল, দাদা আইনস্টাইন তো ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন।

তাদের কৌতুকবোধে তিনি পীড়িত হতেন না। কারণ তাঁর মনে হত আইনস্টাইন ধ্রুব সত্যের অধিকারী। তিনি তার অনুসরণকারী। ঈশ্বরে তাঁরও অমোঘ বিশ্বাস আছে—এরা ছেলেমানুষ বলেই লঘুগুরু জ্ঞানগম্যি কম। ছেলেমানুষ বলেই যখন তখন রসিকতা করতে পারে, বয়সের দোষ। তারপরই তার সারমর্ম আলোচনা। কখনও নিয়তি অথবা আত্মা, পরমাত্মা, পরলোক, প্রেতলোক। এক একদিনের আলোচনায় এক একটি বিষয় উঠে আসত।

সোমনাথদা শুরুই করলেন, মিহির তোমরা তো নাস্তিক—ঈশ্বর বিশ্বাস কর না। আত্মাপরমাত্মা বিশ্বাস কর না— আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীদেরও সারা- জীবনের বিজ্ঞানচর্চার নির্যাস সেই এক প্রশ্ন জুড়ে—ঈশ্বর আছেন কি নেই!

রঙ্গন বলেছিল, দাদা, আইনস্টাইন তো ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন বলে শুনেছি।

সোমনাথদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, শোনো রঙ্গন, বিশ্বাস আর অন্ধবিশ্বাস এক কথা নয়। তিনি বিজ্ঞানের হেতু থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সারা জীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন।

সোমনাথ বুঝতে পারছিলেন, তাঁর কথার কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না। একবার তো রঙ্গন বলেই ফেলল, দাদা ও-সব ছাড়ুন। মিহিরকে খাওয়াতে হবে, কবে খাওয়াবেন!

নিশ্চয় নিশ্চয়! এত বড় সুখবর যখন তাকে তো খাওয়াতেই হবে।

রঙ্গন সিগারেট ধরাল।

তারপর বলেছিল রঙ্গন, কাগজে ওর চাকরি হয়েছে বিশ্বাস করছেন না দাদা!

করব না কেন রঙ্গন!

এমন ভাবে বললেন, মনে হয়, হয়নি, বোধহয়।

এমনিতেই এত বড় খবরটা মিহির তাঁকে না দেওয়ায় কিছুটা যেন ম্রিয়মাণ। তাঁর আশা সবার আগে তাঁরই খবর পাওয়ার কথা, কারণ মিহির যখন হতাশ, হবে হবে করেও হচ্ছে না, এম এ পাশ বেকাররাও লাইন দিয়ে আছে, তখন যিশুদার এক কথা, হবে, চিন্তা কর না—দেরি হচ্ছে—দু-একদিনের মধ্যে পাকা খবর পেয়ে যাব—অথচ যেদিন যিশুদা দরখাস্ত দিতে বলেছিলেন, মিহিরের কেন যে মনে হয়েছিল, দরখাস্ত টাইপ করে দিতে পারলেই তার কর্তব্য শেষ, তার চাকরি হয়েই গেছে এমনও সে ভেবেছিল—এবং মেসের সবাইকে সে খবরও দিয়েছে, অথচ কেন যে দিন যায়, হয় না। ব্যাজার মুখে সে ঘরের জানালায় বসে থাকে—কোনও কাজে মন দিতে পারে না—

তখন একমাত্র সোমনাথই বলেছিলেন, সব পূর্ব নির্দিষ্ট, এত হতাশ হলে চলে, যিশুবাবু যখন কথা দিয়েছেন—

মিহির বলেছিল, কবে হবে বুঝছি না। বাড়িতে চিঠিও লিখতে পারছি না। রোজই ভাবি দপ্তরে গেলেই হয়তো যিশুদা বলবেন, যাও চিঠি হয়ে গেছে। কেন যে হচ্ছে না, মন মেজাজ আমার খুব খারাপ দাদা। কবে এসেছি বাড়ি থেকে, একটা চিঠি না পেলে সবাই যে দুশ্চিন্তা করে। ভাবলাম, চিঠিটা পেলে সোজা বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসব।

যাও তাহলে, কালই বাড়ি চলে যাও। চিঠি তো হাতে পেয়ে গেছ।

আর সুহাসিনী যে তার প্রতীক্ষায় বসে আছে কেউ তো জানে না, সুহাসিনী তো ছোটগোঁসাই ছাড়া কিছু বোঝে না। সে বাড়ি গেলেই সুহাসিনীর প্রাণে ঝড় উঠে যায়, কীভাবে যে ছোটগোঁসাইকে পালিয়ে পালিয়ে দেখে, আর এটা ওটা তার ঘরে রেখে যায়, হাতমুখ ধোয়ার জল আর সকালের খাবার লুচি, আলুরদম, সে কি খেতে ভালোবাসে, তার জামাপ্যান্ট, বইপত্র, সবই সুহাসিনীর নখদর্পণে।

সেই যাওয়া যা তার এখনও হল না।

তার একটাই তো চিন্তা, সুহাসিনী সব ঠিকঠাক আছে তো—কোনও বেতাল হলেও আর ভয় নেই। আমার একটা চাকরি হয়ে গেছে। তোমার সব বিপদ বহন করার ক্ষমতা আমার আছে। আতঙ্কে আছি, তুমি ভালো আছ তো? চিঠি দিতে পারিনি, কাল পারি তো সকালের ট্রেন ধরব।

সুহাসিনীর কথা ভাবলেই তার মন ব্যাজার হয়ে যায়। সোমনাথদা ঠিক টের পেয়েছেন—

এই কি আবার বিমর্ষ ভাব কেন তোমার মিহির! আচ্ছা তোমাকে কেন উৎফুল্ল হতে দেখি না। ইয়াং ছেলে এখন দু-হাতে সব কিছু লুটেপুটে খাবে। আনন্দই হল প্রাণের উৎস। আমরা সবাই সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছারই প্রকাশ। প্রাণ সৃষ্টির জন্যই এই ব্রহ্মাণ্ড। ঈশ্বর নিজেও ইচ্ছে করলে এই ব্রহ্মাণ্ডকে অন্যভাবে গড়তে পারতেন না। বিজ্ঞানের নিয়মশৃঙ্খলার বাইরে যাওয়ার অধিকার কারও নেই। তোমার চিঠি পাওয়া না পাওয়া কোনও শৃঙ্খলার মধ্যেই জড়িয়ে আছে।

সোমনাথদার সঙ্গে কথা বললেই মনটা কেমন শান্ত হয়ে যায়। মিহির সোমনাথদাকে এ-জন্য খুবই পছন্দ করে।

এখন তাহলে সোমনাথদা এক রাউন্ড চা হয়ে যাক। রঙ্গন বলেছিল।

শুধু চা কেন, এত বড় খবর—পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে বললেন, চা-এর সঙ্গে গরম গরম বেগুনি পিঁয়াজি।

মিহিরই মামাকে ডেকে বলেছিল, অখিলের দোকান থেকে গরম পিঁয়াজি, বেগুনি। পাঁচ টাকার নোটটা সে এগিয়ে দিল।

সোমনাথ বললেন, এক ঠোঙা মুড়ি।

খুব জম্পেশ করে খাওয়া যাবে। তারপরই কী ভেবে রঙ্গন বলল, একটা কথা বলব দাদা।

বল না, একটা কেন একশোটা।

আমরা তো ঈশ্বর মানি না। ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই—

সোমনাথ পদ্মাসনে বসে চোখ বুজে সিগারেট টানছেন। বল বল, থামলে কেন।

না, বলছিলাম আইনস্টাইনের স্বপ্নটা নিয়ে একটা যদি প্রবন্ধ লিখে দেন। কাগজে ছাপা যদি যায়, ও তবে কী যে হবে না! আমাদের লিটলম্যাগ 'পদ্মপাতা'র সুনাম চরচর করে বাড়বে।

হবে হবে। তবে হাজার হাজার পাতা লিখেও স্বপ্নটাকে ঠিক ধরা যায় না।

মিহির বলেছিল, স্বপ্নটা কি বীজমন্ত্রের গুহ্য কথা।

হতে পারে, নাও পারে।

তখনই রঙ্গন বলেছিল, এখন গুহ্য কথা বাদ দিয়ে গরম বেগুনি খাওয়া যাক, ধরুন।

তোমরা খাও না।

আমরা তো খাবই। আপনি আগে খান। গুহ্য কথা নিয়ে আলোচনা চলুক।

আঃ। বেগুনি মুখে দিয়ে বললেন, দারুণ। আচ্ছা সূর্য পারে কি পশ্চিম থেকে পুবে পাড়ি দিতে?

কী দায় পড়েছে দাদা, উলটো মুখে যাত্রা করার? বেশ তো সকাল হচ্ছে, পুবে তিনি উদয় হচ্ছেন, পশ্চিমে তিনি দিনশেষে অস্তগমন করছেন, আবার সকালে উঠছেন।

দায় নয়, দায়ের কথা বলছি না। পারে কি না বল? এই নিউক্লিয়ার অগ্নিকুণ্ডলী আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। অথচ দ্যাখ তিনি ঈশ্বরের দাসানুদাস, নিয়মের বাইরে এক পাও নড়তে পারেন না। কাল মহাকাল ধরে তার এই নিরবধি যাত্রা। উলটোমুখে যাত্রা করার সাধ্যিই নেই তার। তাহলে যে আদেশ লঙ্ঘন হয়। বোঝো।

যদি হয়। মিহির চা-এর কাপ হাতে নিয়ে বলেছিল।

হলে ওলটপালট। ব্রহ্মাণ্ড শেষ।

নিয়মের বাইরে কিছুই হয় না, কিন্তু দাদা।

আর কিন্তু না। গাছের আপেল কি পারে আকাশপানে উঠে যেতে?

রঙ্গন বলেছিল, ও-সব তো মাধ্যাকর্ষণের ফল, ছেলেবেলার পাঠ থেকেই জানি।

এই আকর্ষণটুকু না থাকলে এই মহাবিশ্বের কোনও বন্ধনই থাকত না। তপ্ত বালুকারাশি থেকে খই ফোটার মতো সব গ্রহনক্ষত্র কবেই ফুটে যেত। দূর দূরাতীত নক্ষত্র থেকে ছায়াপথ, অতীত অনতীত সবই এক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। ঈশ্বরের কাছে আমরা এ-জন্য ঋণী।

মিহির চাকরিটা হয়ে যাওয়ায় খুবই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এত কথা একসঙ্গে সে কখনও বলে না। আজই সে সোমনাথদার মুখের উপর কথাগুলি না বলে পারল না—কারণ পরলোক পুনর্জন্ম আত্মা এই সব নিয়ে তাদের তর্কের শেষ থাকে না। সে শেষে বলল এগুলি আছে বলেই, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ছিন্নমূল হতে হয়েছে—সমাজে নানারকমের সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে, নিজের ধর্মের জায়গা থেকে কেউ এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়ছে না। অথচ ধর্মের নামে, যা মানে বলছিলাম, বানানো ঈশ্বরের নামে অজস্র ধাপ্পার শিকার মানুষ। ঈশ্বর না থাকলে মানুষের কোনও ক্ষতি হয় না।

কী বললে! ঈশ্বর না থাকলে মানুষের কোনও ক্ষতি হয় না। মিহির সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে এ-ভাবে বলতে নেই। এতে পাপ হয়। কেন অকারণ তাকে

দুষছ। আচ্ছা উঠছি।

সোমনাথদা প্রকৃতই রাগ করেছেন ভেবে মিহির নিজেই ক্ষমা চেয়ে নিল, বলল, দাদা স্বামীজি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-এঁরা সব শ্রদ্ধেয় মানুষ, তাঁদের ছবি দেয়ালে টাঙালে মার্কসের আর কতটা ক্ষতি হবে। দেয়ালে তাঁদের ছবি টাঙিয়ে রাখলে, আপনি যদি খুশি হন, আমরা নিশ্চয়ই টাঙিয়ে রাখব।

দরজা থেকে তিনি ফিরে এসে ফের তক্তপোশে বসেছিলেন কেন, মিহির বুঝতে পারছিল না। পাপ হয় কথাটাতে মিহির খুবই দমে গেছে—সুহাসিনীকে নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই। সুহাসিনী ছোটগোঁসাই ছাড়া কিছু বোঝে না। ওদুদকাকা কোথায় যেন গেছেন সুহাসিনীর বাবা-মাকে খুঁজতে। বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সুহাসিনী তাঁর ফেরার আশায় বসে আছে, মিহির আর্তগলায় বলেছিল, অন্ধকারে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ সুহাসিনী। তুমি নিজের কথা ভাববে না!

আমার তো গোঁসাই নিজের বলতে কিছু নেই। তুমি আমাকে যথেচ্ছ ভোগ কর। আমি জানি আমার সিদ্ধান্ত সঠিক।

সিদ্ধান্ত!

হ্যাঁ সিদ্ধান্ত।

কীসের সিদ্ধান্ত।

আমি পুত্রবতী হয়ে গেছি।

পুত্রবতী হলে আমাকে জড়ালে কেন?

কাউকে জড়ায়নি গোঁসাই। যে যার মতো নিজেই জড়িয়ে গেছে।

কিন্তু.....কেমন অসহায় উচ্চারণ মিহিরের।

আমি ঈশ্বরের দেখা পেয়েছি গোঁসাই। জানি তুমি আমাকে উন্মাদ ভাববে। কোনও লক্ষণ ছাড়াই আমি তোমার বীজকে ধারণ করেছি। সব লক্ষণই ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হবে।

মুখ তার আবার ব্যাজার হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ বললেন, কী হল, হঠাৎ তুমি চোখমুখ অন্ধকার করে ফেলছ—কী হয়েছে তোমার!

না না, কিছু হয়নি। আপনি বলুন, মিহির সহজ হবার চেষ্টা করেছিল।

বুঝলে মিহির বিজ্ঞান গবেষকদের বহুকালের প্রচেষ্টা অথবা বলতে পার অধ্যবসায় বিফলে যাচ্ছে মহাবিশ্বের বেশ কিছু সৃষ্টিরহস্যের বেলায়। বিজ্ঞান তার তল খুঁজে পাচ্ছে না।

রঙ্গন বলল, আসলে বলুন দাদা ঈশ্বরকে তাঁরাও অস্বীকার করতে পারছেন

না। আর সেই দুর্বলতার সুযোগে মানুষেরা যথেচ্ছভাবে তাঁকে ব্যবহার করছে। ঈশ্বরের নামে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। জাতিদাঙ্গা, আর মৌলবাদের রমরমা বাজার।

কিন্তু ঈশ্বর যে আছেন। বিজ্ঞানই পারে ঈশ্বর সম্পর্কিত সব রহস্যের সমাধান করতে।

তারপর থেমে সোমনাথদা বলেছিলেন— এই অভিলাষ আইনস্টাইনেরও ছিল।

সেটা কী!

মানুষের বসবাসের উপযোগী কোনও গ্রহ যেখানে প্রাণ সৃষ্টি হবে, অথবা বলা যায় ঈশ্বর তার প্রতিচ্ছায়া নির্মাণে এই ভূখণ্ড আমাদের দিয়েছেন—এটা ঈশ্বরেরই অভিলাষ। তাঁর মতো করে মানুষ সৃষ্টির জন্যই এই গ্রহের নির্মাণ।

যেমন ধর পরমাণুর কথা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের ভরগুলো একটু অন্যরকম নয় কেন? ইলেকট্রন কিংবা প্রোটনের চার্জ আর একটু বেশি বা কম নয় কেন?

এ তো আর এক মহাব্যোম দাদা—কিছু বুঝছি না। রঙ্গন মাথা চুলকাতে থাকল।

একটু চেষ্টা করলেই কিছুটা বুঝবে। দুটো বস্তুর মধ্যে সর্বদা বিরাজমান যে আকর্ষণ-বল আইজাক নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন—তা এদের ভর এবং দূরত্ব ছাড়া আরও একটা সংখ্যার উপর নির্ভর করে। ওটাকে বলে মহাকর্ষীয় সংখ্যা। এই সংখ্যাটা কেন একটু ছোট বা বড় নয়। বিজ্ঞানীরা জানেন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে এ-রকম আরও অনেক জিনিস আছে, সেগুলি কেন যে তাদের নিজেদের মতো—এক চুল অন্যরকম নয়।

মিহির বলেছিল, অন্যরকম নয় কেন?

সোমনাথদা বলেছিলেন, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। অন্যরকম হলে প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব হত না এই গ্রহে।

রঙ্গন বলেছিল, এত প্যাঁচ কেন দাদা, তার চেয়ে অনেক সোজা ব্রহ্মার অণ্ড থেকে ব্রহ্মাণ্ড ভাবলে বেশি সহজ হয় না কি!

তারপর রঙ্গন তার চা শেষ করে, টেবিলে কাপ রেখে বলেছিল, ব্যাখ্যা না থাকলেই ঈশ্বর, ব্যাখ্যা থাকলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকত না, তাই না।

সোমনাথদা কিছুটা যেন বিব্রত হয়েই বলেছিলেন, তোমাদের সঙ্গে এঁড়ে তক্ক করব না।

মিহিরের প্রশ্ন, অন্যরকম হলে কী হত?

সোমনাথদা কেমন গম্ভীর গলায় বললেন, সৃষ্টিকর্তার মানসপুত্রের জন্য একটি গ্রহ সৃষ্টির সাধ হয়। এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ই তাঁর এটা মাথায় ছিল। বার বার বলেও তোমাদের মাথায় কেন যে ঢোকাতে পারছি না, বলছি তো ইলেকট্রনের চার্জের পরিমাণ যা আছে তার চেয়ে যদি কম বেশি হত, তা হলে এই মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন কেন, কোনও পরমাণুই তৈরি হত না, কী বললাম!

কোনও পরমাণুই তৈরি হত না।

বেশ। এক কথা বার বার বলতে ভালো লাগে না। আমারও ঠিকঠাক মনে থাকে না। নিউট্রনের ভর এক চুল কম হলে এই মহাবিশ্বে মিলত শুধু হিলিয়াম। এই গ্রহটি তৈরি হত না।

বুঝলে ঈশ্বর তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার যতটুকু যা দরকার—হিলিয়াম চাই। প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে যা একান্ত জরুরি। একটু কম বেশি হলে পাওয়া যেত না কার্বন অক্সিজেন ইত্যাদি। মহাকর্ষীয় সংখ্যাটি কম হলেও বিপদ, বেশি হলেও বিপদ, সব পুড়ে ছারখার হয়ে যেত নিমেষে। নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহ নির্মাণের সময়ই মিলত না।

মিহির দেখেছে, সোমনাথদার সঙ্গে আলাপ হবার পরই বিজ্ঞানের নানা থিয়োরি উল্লেখ করে তিনি ঈশ্বর আছেন এটা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতেন।

মিহির বলেছিল, আপনি বলতে চান ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই এই পৃথিবী। ঈশ্বরের কি এটা স্বপ্নপূরণ? যা তিনি চেয়েছিলেন মানুষের নিক্তির মাপে এই গ্রহটিকে গড়েছেন। সাজিয়েছেন। প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আরে সোমনাথদা বলছেন কী!

এখনও তা বলতে পারছি না।

তবে বৃথা তর্কে লাভ কি সোমনাথদা?

ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে আরও কিছু পরিমাপ, তত্ত্ব এবং পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞানীরা কাজ করে যাচ্ছেন, আশা করি তাঁরা আইনস্টাইনের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন। আমিও আছি তাদের সঙ্গে। ঠিক আছে, অনেকক্ষণ বকবক করলাম আমার মাথা ধরেছে। মাথা ভার ভার ঠেকছে।

মিহির বলেছিল, মাথা ভার ভার ঠেকছে আমারও।

রঙ্গন বলেছিল, যা ওঠ। যা অবস্থা, মাথার কী দোষ বল।

সোমনাথদা বারান্দাতে পায়চারি করছিলেন।

মিহির তাঁকে ডেকে বলেছিল, কাল সকালের ট্রেনে বাড়ি যাচ্ছি।

যাও। সাবধানে যাবে। তোমার কাজের এত বড় খবরটা বাড়িতে দিয়ে আসা দরকার। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। গোছগাছ করে নাও। কিছু কেনাকেটা করবে না? মা বাবা তো আশায় আশায় বাঁচেন। পুত্রের কাজে হয়েছে, যাকগে যাত্রার সময় শুভ অশুভ জেনে নিলে পারতে। মানুষের আপদ বিপদের তো শেষ থাকে না।

আসলে সে মা-বাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েনি। কিংবা মা-বাবার আকর্ষণেও সে দেশে ছুটে যাচ্ছে না। সেই সুহাসিনী, সেই কামনাবাসনার অধিকারিণী যে তার যোনিদেশ ভোগ করার জন্য মেলে ধরেছিল এবং যে রতিক্রিয়ায় পাগল হয়ে উঠেছিল—ঈশ্বর কি জাদুতে কিংবা স্বপ্নে যে তিনি সুহাসিনীকে গড়েছিলেন।

সিঁড়ি ধরে সে নামছিল।

বোর্ডারদের পাত পড়ে গেছে দোতলার বারান্দায়। যে যার থালা গ্লাস নিয়ে নীচে ছুটছে। কতকাল পর যেন মিহির সুহাসিনীকে দেখবে।

সুহাসিনীর বিপদ হলে শেষ পর্যন্ত যে কী হবে! সে সুহাসিনীর কথা ভেবে কিছুটা বিহ্বল। তাকে নিয়ে এই কলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকা যায় কিনা—ভেবেছে রঙ্গনকে সে সবই বলবে।

আমি কী করব বল। সুহাসিনীর বিপদ হলে এবং ধরা পড়ে গেলে, বাবা তাঁর কুলাঙ্গার পুত্রের মুখ আর দর্শন করবেন না। তাঁর মুখে কালি পড়বে। একজন শূদ্রাণীকে প্রেম! ঠাকুর তার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন!

পেছনে পেছনে রঙ্গনও থালা গ্লাস নিয়ে নামছে—আবছা অন্ধকার—ষাট পাওয়ারের আলো সিঁড়িতে ঠিকঠাক পৌঁছায় না।

কী হল পড়ে যাচ্ছে কেন?

রঙ্গন কী করবে বুঝতে পারছে না।

সিঁড়িতে আলগা পা ফেলতেই মনে হল সে পড়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে উঠল, সুহাসিনী আমি পড়ে যাচ্ছি। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সে রঙ্গনের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে, সোমনাথদা, বাবুজি, অবিনাশবাবু, শিগগির আসুন, মিহির পড়ে গেছে নীচে, পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তিন

বাবার চিঠি পেয়েই মিহির সেবারে দেশে গিয়েছিল। পত্রে জানিয়েছিলেন সুহাসিনী নাম্নী এক কিশোরীকে নিয়ে ওদুদকাকা নাকি পূর্ব পাকিস্তান থেকে হাজির। ওদুদকাকার কথা সে জানে। বাবার মিতা হন্। কিছুদিন নিখোঁজ ছিলেন তিনি, তারপর দূরদেশে কোথাকার চরের কোন্ এক মসজিদের তিনি ইমাম। বড় হয়ে ওদুদকাকাকে সে দেখেনি। তবে শুনেছে, ওদুদকাকার কোলেপিঠে সে মানুষ। ওদুদকাকার স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্রের গুটিবসন্তে পচে গলে মৃত্যু হওয়ায় উনি কিছুটা উন্মাদ হয়ে যান্। সারাদিন ওপরয়ালাকে মুখে যা আসত তাই বলতেন। মিহির জানে সেসময় বাবা-কাকারা তাঁকে বাড়িতে তুলে আনেন, এবং পুত্রের শোকতাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে তিনি কোলেপিঠে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন।

সে যাই হোক, মিহির সবার সঙ্গে ওদুদকাকার জন্যও একটি লুঙ্গি কিনে আনে।

সুহাসিনীকে সে দেখেনি, চিনেও না, কেবল জানে বাপ-ঠাকুরদার শিষ্য হারাণ পালের সে বড় কন্যা। তার জন্যও একটি ফুলছাপ শাড়ি, মা এবং ভাইদের জন্য জামাকাপড় নিয়ে আসে। বাড়িতে সে সুহাসিনীকে দেখতে পায়, লজ্জায় খুব কাতর, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, এবং মায়ের তাড়া খেয়েই সে তাকে প্রণাম করার সময় বলে, 'আপনি ছোট-গোঁসাই। তাইন কইছে, আপনেরে দেখলে আমার নাকি শোকতাপ জল হইয়া যাইব।'

পরে, মিহির বুঝেছিল, তাইন অর্থাৎ ওদুদকাকা তাকে নিয়ে শেষ আশ্রয় হিসাবে তাদের বাড়িতে উঠেছেন, তার আগে ওদুদকাকা শীতে বর্ষায় পূর্ব পাকিস্তানের নানা জায়গায় সুহাসিনীর মা-বাবার খোঁজে ছিলেন, তারা যে বেঁচে আছে লোক পরম্পরায় ওদুদকাকা জানতেন। তবে কোথায় গিয়ে তাঁরা উঠেছেন, তা তিনি জানতেন না—বর্ষায় সুহাসিনীকে সঙ্গে নিয়েই ঘুরতেন কারণ এক সকালে তিনি দেখেছিলেন মসজিদের পাশে একটি মেয়ে পড়ে আছে। অচৈতন্য। আল্লার কাছে তিনি দায়বদ্ধ, কাজেই সুহাসিনীর মা-বাবার খোঁজ না জানা পর্যন্ত তাঁর নিস্তার ছিল না।

মিহির বাড়ি এসেও শুনেছিল, ওদুদকাকা সপ্তাহের কাবারে বের হয়েছেন। বেথুয়াডহরি হয়ে শান্তিপুর এবং তারপর রেল-লাইনের ধারে যে সব উদ্বাস্তু বাড়িঘর বানিয়ে আছেন, তাদের কাছে দেশের লোকজনের খবর নিতে নিতে

তিনি একসময় প্রায় ফকির হয়ে গেছিলেন। অবশ্য বাবা বলতেন ওদুদের মাথাটা গেছে। ও-ভাবে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ওদুদকাকা অবশ্য সেদিনই বাড়িতে ফিরে আসেন। একেবারে দরবেশ—লম্বা আলখাল্লা গায়, বগলে ঝোলা, ঝোলার মধ্যে কত কিছু আছে, না দেখলে বোঝা কঠিন।

ওদুদকাকার কথা শুনে মনে হল, তার মা বাবা ভাই বোনদের খোঁজ পাওয়া গেছে, তবে তারা বিশেষ করে সুহাসিনীর বাবা হারাণ পাল সুহাসিনীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। বলেছে, তাদের পরিবারে দাঙ্গায় কেউ হারিয়ে যায়নি, সুহাসিনী বলে তার কোনও মেয়েও নেই, অন্যের মেয়েকে কে কবে ঘরে তুলে নেয়। একজন হিন্দুমাইয়া দু-বছর ধরে একজন মুসলমানের আশ্রয়ে থাকলে তার জাত থাকে না—সুহাসিনীকে নিয়ে তুললে লাঠালাঠি, এমনকী আত্মহত্যারও ভয় দেখিয়েছে হারাণ পাল। হারাণ পালের বিবাহযোগ্য আরও কন্যা আছে। জাত গেলে জাত ফিরে পাওয়া যে কঠিন ওদুদকাকা তাও বুঝেছিলেন। শুধু বলেছিলেন, ক্ষীরোদভাই হারাণ পালের দোষ নেই। সমাজের দোষ। সে তার বড় কন্যাকে অস্বীকার করেছে।

তার মা-বাবার অস্বীকারের খবরে বাড়িটা থ—বাবা জ্যাঠা কাকারা সবাই হাজির। এমন একটা ঘরোয়া খবরে সবাই বিভ্রান্ত, আর তখন কিনা সুহাসিনী অতি স্বাভাবিক গলায় সবার সঙ্গে কথা বলছে। যেন মাথার উপর ঈশ্বর থাকলে এমন হয়েই থাকে।

সে স্বদেশমামাকে বলল, ঘরে গিয়া বসেন। কী ঠাণ্ডা!

তা শীত পড়েছে। সব শীতল হয়ে আছে। সুহাসিনী আঘোরজ্যাঠার শাশুড়িকে বলল, দিদিমা উঠানে খাড়াইয়া থাইকেন না। বারান্দায় উইঠা বসেন।

ওদুদকাকা কেমন পাগলের মতো একবার বারান্দা, একবার উঠোন, একবার নিজের ঘরে ছোটাছুটি করছেন, আর বলছেন, ক্ষীরোদভাই মাইয়াখানের, কী হইব? অঘোরভাই মাইয়াখান কোনখানে যাইব, তাইনের ভবিষ্যৎ কী—ওপরয়ালার এই কি বিধান!

বাবা বলেছিলেন, ওদুদ ঠাণ্ডা হইয়া বস। হারাণরেও দোষ দেওয়া যায় না। তার সমাজ সংসার আছে, তার ধর্ম আছে, অস্পৃশ্য এক নারীকে সে ঠাঁই দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেই পারে। মাথা গরম কইরা আর ওপরওয়ালাকে খিস্তি খেউড় করিস না।

কে শোনে কার কথা! আমি পাগল হইয়া যামুরে আল্লা, আমারে কেউ ঠেকাইতে পারব না। আরে হারাণ, এই তর জানমান, খ্যাতা পুড়ি এই জানমানের।

হঠাৎ কাঁথা লেপের ভিতর থেকেই শুনতে পেল, সুহাসিনী ওদুদকাকাকে ধমকাচ্ছে। না আর পারা যাচ্ছে না। সে কাঁথা লেপ সরিয়ে উঠে বসল।

এক কথা সুহাসিনীর, থামেন।

অনেক হইছে—কী গন্ধ শরীরে। কে আপনেরে ঘুরতে কইছে। আমার বাবা মায়েরে খুঁজতে কইছে। শরীরের কী অবস্থা করছেন! আমার বাবা কাকারে অমানুষ কইতাছেন, আপনে নিজে কি মানুষ! নিজের দিকে চাইয়া দ্যাখেন।

ওদুদকাকার সামনে ধোওয়া জামাকপড় নিয়ে সুহাসিনীর এক কথা। আপনে থামেন, অনেক হইছে। সানে যান।

জব্বর শীত পড়েছে। মিহির চাদর গায়ে সবার সঙ্গে বারান্দায় বসে আছে। হঠাৎ মিহির দেখল ওদুদকাকাকে হাত ধরে সুহাসিনী উঠোনে নামিয়ে আনছে।

এই যে আপনের বালগোপাল।

ওদুদ মুহূর্তে কেমন স্থবির হয়ে গেছিল।

তারপর ফের বলেছে সুহাসিনী, আপনের বালগোপালরে চিনতে পারতেছেন না। আমার ছোটগোঁসাই। আপনের খোকা, তাইন কত বড় হইছে চক্ষু মেইল্যা দ্যাখেন।

তুই খোকা! আমার খোকা কত বড় হইয়া গ্যাছে!

সুহাসিনী ফের ধমক দিল, আদর পরে করবেন, আগে সানে যান। কলপাড়ে দুই বালতি গরমজল আছে। এই থাকল সাবান। আপনের বালগোপাল একখান লুঙ্গি কিনা আনছে। কলপাড়ের বাঁশে লুঙ্গিখান আছে। ধোওয়া জামা, গরম গেঞ্জি সব আছে। তারপর মিহির দেখেছিল, ওদুদকাকা স্নান করে জামাকাপড় পরে বারান্দার একপাশে নিজের আসনে খেতে বসে গেলেন।

সুহাসিনী ওদুদকাকার পাতে গরম ভাত, ভাজা ফুলকপির ডালনা দিচ্ছে। কিন্তু মাছের ঝোল দিচ্ছে না। মা তাকে আর নীহারকে ভাত বেড়ে দেবার সময় বলল, তর ওদুদকাকা মাছ মাংস খায় না। নিরামিষ খায়।

অঘোরজ্যাঠা বাবাকে কেন পেছনে নিয়ে গেল, কীই বা পরামর্শ করল, সবচেয়ে মিহির বেশি বিস্মিত। দীর্ঘকায় এমন একজন অতিশয় মানুষ ওদুদকাকা, সুহাসিনীকে এত ভয় পায় কেন?

মিহির নিজেই ধমক দিতে পারত।

কী হচ্ছে সুহাসিনী! বাবা জ্যাঠার বয়সি মানুষের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় জান না!

খুব বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধমক না দিয়েও পারেনি—

আশ্চর্য অবাধ্য নারীর মতো সুহাসিনী ফুঁসে উঠেছিল—

না, জানি না। আপনে কি বোঝবেন। আমার বাবা মানুষ কি অমানুষ, আমি বুঝব। তাঁর এত কথা বলার কী দরকার। দেখছেন না ঠাণ্ডায় দাঁড়াতে পারছেন না, তবু তড়পানি কমছে না মানুষটার! চিরটাকাল আমারে তাইন জ্বালিয়ে খেল। কতবার কইছি আপনে আমারে ছাইড়া দ্যান—দুই চক্ষু যেদিকে যায় যামু গিয়া। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। পাকিস্তানে তাইন আমার বাবা মায়ের খোঁজে কত জায়গায় গ্যাছেন—সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি। আত্মীয়দের অপমান গায়ে মাখিনি। তখন না হয় আশা ছিল আমার বাবা-মার খোঁজ পেলেই তেনার মুক্তি—এখন কী হইব কন। দুই চক্ষু যেদিকে যায়, বললেই, মিঞার চক্ষে পানি। বোঝেন এখন আপনে কই থাকবেন, আমি কই থাকমু।

এই সব কথার পরই বাড়ির উঠোন ফাঁকা হয়ে গেল। স্বদেশমামা, পরেশমামা, সবিতা, নীলু, বড়জেঠি, বড়জ্যাঠার দুই শাশুড়ি বাড়ির উঠোন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই চলে গেল। ক্ষীরোদ সান্যাল ফাঁকা উঠোনে একা দাঁড়িয়ে শুধু বলেছিলেন, ঠাকুর সবই তোমার ইচ্ছা!

সুহাসিনীর নানা দুর্ভাবনায় মিহিরেরও রাতে ঘুম আসছিল না।

বাড়িটায় ছোট ছোট সব ঘর টিনের, ছনের। মুলি বাঁশের বেড়া। মাটির দেয়াল কোনও ঘরে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা সব চলে আসছে। কলোনিতে জমি কিনছে, ঘরবাড়ি বানাচ্ছে।

সে তার নিজের ছোট ঘরটায় কাঁথা লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। তার টেবিলে কিছু বইপত্র। একটা একজনের মতো চকি। দেয়ালে সুহাসিনীর নানা কারুকাজ। পিটুলি গোলায় নানা ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। সে আসবে শুনে ঘরের সবই বড় পরিপাটি করে রেখেছে সুহাসিনী।

সুহাসিনীর কী হবে!

সে কি শেষ পর্যন্ত এই বাড়িতেই থেকে যাবে। বাপ-জ্যাঠারা কি সুপাত্রের বন্দোবস্ত করে দু-হাত এক করার চেষ্টা করবেন! সমাজ কি তাকে গ্রহণ করবে!

রাত গভীর। ঘুম আসছে না। এমন দুর্ভাবনা থাকলে ঘুম আসেও না। তবু ঘুম চোখে লেগে এসেছিল—আর তখনই জঙ্গলে ডাহুক পাখিদের কলরব।

মিহির জেগে গেল।

আর তখনই মনে হল তার, জ্যোৎস্না রাতে যেন কাছে কোথাও কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কান্না, না প্রকৃতির মধ্যে শীতের কনকনে ঠাণ্ডা করাতের দাগের মতো গভীর হয়ে কোন ক্ষত সৃষ্টি করছে। কুয়াশার হিমেল বিন্দু বিন্দু জল, ধরণীতে প্রক্ষিপ্ত হলে, এবং শুকনো পাতা ক্রমে ভিজতে থাকলে, অথবা তালপাতায় জলের ভারে কোনও শব্দমালা যদি সৃষ্টি হয়, কারণ শুনশান এই ধরণীর নিজেরও থাকে শীর্ণ অন্ধকার এবং কপালে করোটির ধারা সর্বত্রই বিরাজ করে।

কীটপতঙ্গ ধায়। শীতে তারাও অবাক। নড়তে পারছে না। পাতার অভ্যন্তরে খস খস শব্দ উঠছে।

সব স্থির হয়ে আছে। তবু মনে হয় ফুঁপিয়ে কেউ কাঁদছে।

মিহির উঠে বসল। তারপর দরজা খুলে বের হয়ে এল। বাড়ির আলাদা আলাদা ঘর জমির মধ্যে ছড়ানো ছিটানো, ডিসপেনসারি একটা রাস্তার পাশে। কারণ তার বাবা ক্ষীরোদ সান্যাল সম্প্রতি হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস্ করেন। পসার হয়েছে। মহাদেবদা তার বাবাকে একটা হোমিওপ্যাথির বইও দিয়েছেন। ওদুদকাকা এ-কাজে ক্ষীরোদ সান্যালকে সাহায্য করেন।

তারপরই কেন যেন মনে হল সুহাসিনী যদি হয়। বাড়ির সব কাজ শেষ করে সে খায়। সব কাজ শেষ করে তার ঘরের পাশে আর একটি আলগা ঘরে শোয়।

তার বিছানাও সুহাসিনী করে দেয়। সে শুলে তার মশারিও সুহাসিনী গুঁজে দেয়।

রাতে সুহাসিনী কোনওরকমে খাওয়া শেষ করে কলপাড়ে থালাবাসন তুলে নিয়ে যায়। মা কলপাড়ে একটা হারিকেন রেখে আসে। তারপর যেন সুহাসিনীর প্রতি কারও কোনও আগ্রহ থাকে না—বাড়ির সবাই শুয়ে পড়ে।

ক্ষীরোদ সান্যাল অবশ্য বারান্দায় চেয়ারে বসে থাকেন। মেয়েটার কাজ শেষ হলে এবং হারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলে তিনিও শুয়ে পড়েন। তবে আজ অত্যধিক শীত পড়ায় সুহাসিনীই ওঁনাকে জোরজার করে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছে। তারপর গোঁসাইমাও ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়েছেন। আর সুহাসিনী এই গুরুগৃহে সবার সেবায় উৎফুল্ল হয়ে আছে।

বাড়ি ফিরে মিহির এই সব দেখে ভেবেছিল সুহাসিনীর থাকার যেন সুবন্দোবস্ত হয়ে গেছে। কারণ সুহাসিনীর কষ্ট একমাত্র ওদুদকাকা ছাড়া-আর কেউ বুঝি টের পায় না। কিন্তু সুহাসিনী এতই দুর্মুখ যে ওদুদকাকা তার কাজে কামে কোনও মন্তব্যই করতে পারে না। শত হলেও এই বাড়ি তার গুরুগৃহ। এবং মাথার উপর মহাগুরু সন্তুষ্ট থাকলে অনেক পাপ খণ্ডন হয়।

সুহাসিনী শুয়ে পড়েছে কিনা তাও বুঝতে পারছে না। মিহির তাকে খুঁজছে। কিংবা এমনও হতে পারে সুহাসিনী হয়তো সব কাজ সেরে গোপনে কোথাও বসে চোখের জল ফেলছে। সে সুহাসিনীর ঘরের সামনে যেতেই দেখল, দরজা খোলা। ভিতরে একটা কুপি জ্বলছে। সুহাসিনী ভিতরে নেই।

এ শীতের মধ্যে সে গেল কোথায়!

ওদুদকাকার ঘরে নীহার আলাদা একটা তক্তপোশে শোয়। দরজা বন্ধ। এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বোঝা যায়। বড় ঘরেরও দরজা বন্ধ। অর্থাৎ সে ছাড়া এই বাড়িটায় আর কেউ জেগে নেই। সুহাসিনী ঘরে না থাকায় কোনও প্রাকৃতিক কারণে সে যদি বাঁশঝাড় তলায় যায়? কিন্তু সে টের পাচ্ছে সেই মিহিসুরে ফোঁপানির কান্না আসছে রাস্তার দিক থেকে। তারপরই মনে হল কেউ আর কাঁদছে না।

সে কিছুটা বিভ্রমে পড়ে গেছে। বাঁশঝাড় তলায় যদি যায়। সে অনুচ্চ গলায় ডাকল, তুমি কি কোথাও আছ? আমি যে কেউ কাঁদছে শুনতে পেলাম। তোমার ঘরের দরজা খোলা কেন?

কেউ কাঁদছিল এ-বিষয়ে সংশয় নেই তার। তার গলায় মাফলার। গায়ে ফুল সোয়েটার, তবে একেবারে হিম হয়ে যাচ্ছে শরীর—সুহাসিনী কি পালিয়েছে? তার ভেতরটা ধক করে উঠল। তখনই ফের মনে হল, সুহাসিনী পাশেই কোথাও আছে। এবং সে ডিসপেনসারি ঘরের বারান্দায় দেখতে পেল কোনও ছায়ার মতো কেউ। মিহির এতটাই কাছে গিয়ে ডাকল, যাতে দৌড়ে পালালেও জাপটে ধরতে পারে। তার মা বাবা তাকে অস্বীকার করেছে। অপমানে লাঞ্ছনায় সে একটা কিছু করেও বসতে পারে। এই, কি হল, সাড়া দিচ্ছ না কেন? এখানে বসে কেন? ওঠ! না উঠলে সবাইকে ডাকব।

সর্বনাশ—সুহাসিনীর হাত-পা একেবারে বরফ। সে তাড়াতাড়ি পাঁজাকোলা করে তুলে তার ঘরে নিয়ে কাঁথার ভিতর চেপে দিল। সে দ্রুত সুহাসিনীর হাত এবং পায়ের পাতা ঘসে ঘসে গরম করতে গিয়ে দেখল, সুহাসিনী চোখ মেলে তাকাচ্ছে। মেয়েটা যদি প্রাণনাশের চেষ্টা করে? মেয়েটা তাকাচ্ছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না।

কিন্তু একার পক্ষে এই গুরু দায়িত্ব নেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা সে বুঝতে পারছে না। অবিলম্বে সবাইকে ডেকে তুলে একটা বিহিত করা দরকার। বড়ঘরের বারান্দার মালসায় তুষের আগুন জিয়ানো আছে। রাতে উঠে ক্ষীরোদ সান্যালের তামাক সেবনের অভ্যাস। সুহাসিনীই সব ঠিকঠাক করে রাখে। সেই

আগুনের তাপ দিতে পারলে সহজেই সুহাসিনী উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে ভেবেই সে দরজার দিকে যাচ্ছে। দরজা খুলে বাইরে যাবে।

আর তখনই সুহাসিনী বড় ক্ষীণ গলায় ডাকল। ছোট-গোঁসাই আমাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছ। তারপরই বলল, তুমি ছুঁয়ে দিলে আমার অসুখ থাকে না।

তারপর বলল, তুমি আমার পাশে শোও। তুমি আমায় জড়িয়ে ধরো।

দরজা বন্ধ ঠিক, তবে ছিটকিনি তোলা নেই। সে দরজায় ছিটকিনি তুলে লেপ টেনে শুয়ে পড়বে ভাবল। কিন্তু লেপ কাঁথার যা অবস্থা, একজনের লেপ দু'জনের হয় কী করে!

তুমি এসো না। হয়ে যাবে।

মুহূর্তে সুহাসিনী কেমন সাবলীল হয়ে গেছে। কী সুন্দর মুখ। রতিক্রিয়ার পূর্বাভাস সৃষ্টি হলে কি নারীর মুখের সৌন্দর্য আরও গাঢ় হয়? আর লেপ কাঁথার ভিতর ঢুকে যেতেই মিহির টের পেল সুহাসিনী সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

সুহাসিনী মিহিরের হাত টেনে বুকের উপর জড়িয়ে রাখল। মিহির কিছুটা ক্যাবলু বনে গেছে। কী কী করতে হবে বুঝতে পারছে না। এত পুষ্ট স্তন। স্তনের বোঁটা শক্ত হয়ে গেছে। এবং সুহাসিনীর যেন তর সইছে না। সে উঠে মিহিরকে জাপটে ধরল। যেন জোর করে তার পাজামা খুলে নিচ্ছে—কিন্তু মিহির এতই অধীর যে রমণের আগেই সব স্খলন হতে থাকল।

সুহাসিনী খিল খিল করে হাসছে। তারপর বলা নেই কওয়া নেই মিহিরের হাত টেনে যোনিদেশে স্থাপন করল, তারপর জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে সারারাত জড়িয়ে থাক। ভোর রাতে উঠে যাবে। সে তার গোঁসাইকে ছাড়ছে না, জড়িয়ে শুয়ে আছে। এবং মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ফের সুহাসিনীর উপর সে উঠে গেল। এবং সুহাসিনী তার শরীর দিয়ে তার উত্তাপের সব নির্ণয় করতে গিয়ে সহসা চিৎকার করে উঠল, উঃ লাগছে। আস্তে গোঁসাই।

মিহিরের মনে হল—এই উঃ শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে প্রাণীজগতের সব ক্রিয়া যাকে বলে মন্থন এবং এই মন্থনই মহাপ্রাণ, প্রাণের ঐশ্বর্য মৃত্যু। মাঝখানে ঈশ্বর শুধু জাদু নামক এক পরাবাস্তব।

প্রায় প্রাণঘাতী উঃ শব্দটির মধ্যে এমন দুর্ধর্ষ রহস্যময়তা সৃষ্টি হতে পারে! মিহির তাজা রক্তের গন্ধ পাচ্ছে অথচ সুহাসিনী ভয়ংকর হয়ে উঠছে। মিহিরের কিছুই জানা ছিল না। তাকে ছাড়ছে না। তারা দু'জনেই কেমন বেহুঁশ—তারপর যা হয়ে গেল, ভূখণ্ড ভেদ করে এক বিস্ফোরণে দুজনেই অতলে হারিয়ে

যাচ্ছে—তারপর দুইজনেই ক্লান্ত অবসন্ন এবং পাশ ফিরে শুয়ে আছে সুহাসিনী।

ওদুদ উঠতে গিয়েও উঠলেন না। ফের বসে পড়লেন।

ক্ষীরোদভাই একটা কথা কই।

ক্ষীরোদ তাকালেন। এবং টের পেলেন সুহাসিনীর চিন্তায় ওদুদ কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। হারাণ পাল এবং তার পরিবার সুহাসিনীকে অস্বীকার করায় তিনিও কম চিন্তিত নন। কী হবে মেয়েটার! ওদুদ যে এই চিন্তায় রাতে ঘুমাননি তাও যেন টের পেলেন ক্ষীরোদ।

ক্ষিরোদভাই, মাইয়াখানের বিবাহের কি কোনও বন্দোবস্ত করা যায় না?

এই কলোনিতে সম্ভব না। সবাই জানে তোর লগে সুহাসিনী পাকিস্তান থাইকা পালাইয়া আইছে। সুহাসিনীর হাতে বয়স্ক লোকেরা জলও খেতে চায় না। ক্যাডা বিয়া করব ক।

চেষ্টায় কী না হয় ক্ষীরোদভাই। আমার কিছু ধনরত্ন আছে। কাঠের ছোট কারুকাজ করা বাক্সখানা মাইয়াখানের জিম্মায় আছে। যা আছে মাইয়াখানের এক জীবন হাসতে হাসতে চইলা যাইব।

ক্ষীরোদ বলেছিলেন, সুহাসিনী বাক্সটাকে আমার কাছে জিম্মা রাখছে।

সে রাখুক। আপনে বিশ্বাসী মানুষ। কী আছে না আছে, আপনে বোধ হয় জানেন না।

কী করে জানব! চাবি তো সুহাসিনী দেয়নি।

চাবি আমার কাছেই আছে ক্ষীরোদ ভাই। আপনে কইলে দিয়া দিতে পারি। মসজিদে ইমামের পয়সাকড়ির অভাব থাকে না। একলা মানুষ, খরচও ছিল না। জায় নামাজ থেকে শুরু করে দাফেনের মূল্য ধরে দিয়েছে সবাই। নাজাম পাঠে, কোরাণ পাঠেও আমার ভালো উপার্জন ছিল। এলাকার মানুষজনের অন্ধ বিশ্বাস কইতে পারেন। বেহেস্তের কড়ি যারে কয়। সে যাই হউক বড় হাজির বিবি তার দেন মোহরের সব ধনরত্নই আমারে মরার আগে দিয়া গ্যাছে।

মিহির তখন তার মা মহামায়াকে বলেছিল, বারোটার ট্রেন ধরব মা। ঘরের ভিতর মা ছেলেতে কথা হচ্ছে।

বাইরে বের হলে ওদুদ দেখলেন, মিহিরের মুখও ভারী ব্যাজার। মাইয়াখানেরে নিয়া তাইন যে চিন্তায় আছেন, মিহির আড়াল থেকে শুনতে পারে। ধনরত্নের কথাও শুনতে পারে।

মাইয়াখানের জন্য মিহিরেরও কম চিন্তা না। এটা-ওটার অজুহাত দেখিয়ে

সুহাসিনী তাকে কলকাতায় যেতে দিচ্ছে না এবং গভীর রাতে তার ঘরে এসে হাজির হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে মাথায় এই সুহাসিনীও গন্ধমাদন চাপিয়ে তার ঘুম কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। আবার ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত এই গন্ধমাদন মাথায় তাকে বহন করতে হবে।

তখনই সুহাসিনী প্রায় লাফিয়ে বারান্দায় উঠে গিয়েছিল।

ছোটগোঁসাই আপনের চারটের টেন ধরতে হইব না। বাড়িতে বারের পূজা তাইন চললেন। ঠাকুর দেবতার হুঁশ নাই—কিছু হইলে কে স্যামলাইব।

সুহাসিনী তুমি বুঝছ না, যিশুদা আমাকে দু-দিনের জন্য ছেড়েছেন। পাঁচদিন হয়ে গেল। তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হবেন। তাঁর পাতার প্রুফ আমি না দেখলে শান্তি পান না। তিনি হয়তো ভাবছেন আমার অসুখবিসুখ করেছে। মিহির তো কখনও কাজে নাগা করে না। কলকাতায় তিনি আমার ভরসা বোঝেন!

তা হোক, আপনের যাওয়া হবে না। বারের পূজার প্রসাদ মাথায় না নিয়া গেলে চিন্তার শেষ থাকবে না। তারপর এমন এক দৃষ্টি হেনে ছিল এবং মাথা নীচু করে দাঁড়ালে তার চোখে জল। চোখের জল আড়াল করার জন্যই সে অন্যদিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে।

ছোটগোঁসাই কেন বোঝেন না তিনি ছাড়া আমার আর কেউ নাই। তিনি না থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। সে রাস্তার ধারে, মিহির রিকশায় উঠলে কাছে থাকে না।

চার

ট্রেন চলছে। মিহির জানলায় বসে কত কিছু ভাবছে। এবারে প্রায় মাসখানেক পরে সে বাড়ি ফিরছে। সুহাসিনী কত অধীর হয়ে আছে সে বোঝে। মা বাবা ভাইবোনের চেয়েও কত প্রিয় যে তার এই নারী। সবাই দেখতে এসেছিল তাকে, কেবল সুহাসিনী আসেনি। তার মুখখানি জলের মত টলটল করছে আকাশে। আকাশের সব নক্ষত্র দূরে সরে যাচ্ছে। একফালি চাঁদও আকাশে দেখা দিল। গাড়ি কিছুটা লেটে যাচ্ছে।

মহাদেবদা বললেন, ছোটগোঁসাই আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো। একদম চুপচাপ!

নীহারও বলল, হ্যাঁরে দাদা, তুই কথা বলছিস না কেন।

ওরা তো জানে না, সে যার কথা ভাবছে; তার কথা ছাড়া মাথায় আর

তার কিছু নেই।

শেষ দিকে দেখা গেল সুহাসিনীর টানে মিহির ঘন ঘন বাড়ি আসছে।

সুহাসিনী তার ঘরে এলেই বলত, কিছু টের পেলে?

না কিছু টের পাইনি।

কী বলছ?

কিছু হলেই কি তুমি ছোটগোঁসাই কিছু করতে পারবে।

এক রাতে সে বলেছিল, সুহাসিনী কেউ টের পেলে আমরা আর মুখ দেখাতে পারব না।

এক রাতে স্থির করেছিল, সুহাসিনী এলেই সে দুর্বল হয়ে পড়বে না। তাকে সে ফিরিয়ে দেবে।

সুহাসিনী সন্তর্পণে ঘরে ঢুকলে বলেছিল, প্লিজ সুহাসিনী আজ থাক। কিন্তু অধীর প্রাণচঞ্চলা নারী যে সারাদিন পাগল হয়ে থাকে, সে মানবে কেন?

কেউ টের পেলে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। বুঝছ না কেন যা হবার হয়ে গেছে—আমার নিজের হুঁশ ছিল না। অনেকভেবে দেখলাম, আগে একটা কাজ দরকার। কাজ হয়ে গেলে, কলকাতায় বাসাবাড়ি করে তোমাকে নিয়ে চলে যাব।

সুহাসিনী আর একটা কথাও বলল না।

সে যেন ফুঁসছে।

তারপর অন্ধকারে বের হয়ে গেলে মিহির বুঝল এ-নারী ঘোর সংকটে পড়ে গেছে। সে নিজেকে বিনাশ করলেও আশ্চর্য হবার মতো কিছু থাকবে না।

অন্ধকারে সুহাসিনী হাঁটছে ঠিক, তবে সে ঘরের দিকে যাচ্ছে না। আরে মেয়েটা কোথায় যাচ্ছে। রাস্তার দিকে যাচ্ছে কেন—এই কোথায় যাচ্ছ!

সে সুহাসিনীকে অনুসরণ করছে।

এই মুহূর্তে সুহাসিনীকে রূঢ় কথাও বলা যায় না।

তুমি ওদিকে যাবে না। ঘরে যাও। এত রাতে তুমি কী আরম্ভ করলে বল তো। আর তখনই সুহাসিনীর কী হল কে জানে। সে অন্ধকারে মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে।

মিহির আর পারে!

সে দৌড়ে গিয়ে সুহাসিনীকে জাপটে ধরল।

চল, বাড়ি চল।

না, যাব না।

কী করছ, কেউ দেখে ফেললে কী হবে।

দেখুক বলেই সুহাসিনী দৌড়ে মিহিরের ঘরে ঢুকে গেল। লেপটা দিয়ে নিজের শরীর ঢেকে বলল, এসো না। লেপের নীচে হাত ঢোকালে মিহিরকে পাগল করে তুলল। মুহূর্তে মিহিরের প্রতিরোধ প্রতিবাদ সব চুরমার হয়ে গেল।

তখনই সুহাসিনী বলল, জানো আমি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে সারদা মা বলে গেলেন, তুই পুত্রবতী।

আমি বললাম, আমার কিছুই লাগে না, আমার অবলম্বন চাই। কেউ নেই আমার। একটা অবলম্বন না থাকলে বাঁচব কী নিয়ে।

আমার জরায়ুর জলাশয়ে একটা তিল ফুল ভেসে বেড়াচ্ছে, এমনও বললেন তিনি।

বাড়ির রাস্তায় ঢুকতেই নীহার রিকশা থেকে লাফিয়ে নামল। সবার আগে যে তাকে খবর দিতে হবে, তার দাদা ফিরছে। কিন্তু নীহার দেখল আগেই রাস্তার মুখে সবাই হাজির।

সবাই আছে।

অঘোরজ্যাঠা, স্বদেশমামা, নীলু, সবিতা, মা বাবা সবাই।

কেবল সুহাসিনীদি নেই। তারপর দেখল ওদুদকাকাও নেই।

সে সবাইকে বলল, দাদা পেছনের রিকশায় আসছে।

সবাই অপেক্ষা করছে।

মহাদেবদা পঞ্চাননতলার মোড়েই নেমে গেছেন—তিনি আর বাবাঠাকুরের বাড়ি পর্যন্ত আসেননি। মিহিরও বলেছে, আপনি নেমে যান মহাদেবদা। আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরতে পঞ্চাননতলা হয়ে ফিরতে হয়। ব্যস্ত মানুষ। তাঁকে মিহির সেখানেই ছেড়ে এসেছে। মা হারিকেন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুত্র যে বেঁচে ফিরবে, সে আশাই তার ছিল না। তার বড় পুত্র, সে ফিরছে।

আরোগ্য লাভের পর প্রাণচঞ্চলা নারীকে দেখার জন্য মিহির পাগল হয়ে আছে।

ভিড়ের মধ্যে সেই নেই।

তার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল।

সবাই তাকে রিকশা থেকে নামতে সাহায্য করতে গেলে বলল, আমি ভালো আছি। আমাকে ধরতে হবে না। নিজেই নামতে পারব। একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো সে নেমে বলল, ওদুদকাকাকে দেখছি না।

কেউ কিছু বলছে না।

মিহির ভাবল, ওদুদকাকা যদি বাজারের দিকে যায়। তিনি যেতেই পারেন, তার খোকা ফিরছে। ভালো মন্দ বাজার কিংবা কতই আরও কাজ থাকতে পারে।

সে উঠোনে ঢুকেই ডাকল, এই সুহাসিনী, তুমি কোথায়? সুটকেসটা তুলে রাখো।

এক ঝড়ের রাতে ওদুদকাকা সুহাসিনীকে নিয়ে বাঁচার আশায় বাবার আশ্রয়ে এসে উঠেছিলেন। অথচ এই এক বছরেই সম্পর্ক এত গভীর যে কী সুহাসিনী কী ওদুদকাকা কেউ এ-বাড়ির কারও চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

না তার কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

তার জ্যাঠতুতো বোন, অর্থাৎ অঘোরজ্যাঠার মেয়েরা, এবং জেঠি এমনকী স্বদেশমামা, পরেশমামাও কিছু বলছেন না। তিন-চার বিঘা জমি নিয়ে এক একটা বাড়ি। একই লপ্তে, তবে আলাদা আলাদা, কেবল নীলুই এ-বাড়িতে বেশি পড়ে থাকত। সুহাসিনীর সঙ্গে তার খুব ভাব। প্রায় দুই সখীর মতো দুজনের ছিল চলাফেরা। কাকে সে বলবে সুহাসিনী কোথায়। মাকেও দেখা যাচ্ছে না। নীলুও নেই।

একমাত্র ক্ষীরোদ সান্যালই বারান্দায় বসে আছেন।

তিনি বললেন, আগে হাতমুখ ধুয়ে বসো। কলকাতায় গেলে তোমার দেখছি বাড়িঘরের কথা মনে থাকে না। তোমার জননী সারাদিন রাস্তার দিকে চেয়ে থাকত একটা চিঠির প্রত্যাশায়। আর সুহাসিনী তো খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত। পিয়নের খোঁজে ডাকঘরেও চলে যেত। ভাগ্যিস তোমার জীবন সংশয়ের খবর তোমার পিসি টেলিগ্রাম করে জানায়। সেও তো কত দিন আগে। মেসে গিয়ে উঠলে সে খবরটা পর্যন্ত দাওনি। দায়িত্ববোধ এত কম তোমার।

বারান্দায় হারিকেন জ্বালা। ঘরেও। ওদুদকাকার ঘরে একটা হারিকেন জ্বলত, সেটা জ্বলছে না। ঘরে কেউ আছে বলেও মনে হচ্ছে না।

বাবা!

বল। সুহাসিনীকে দেখছি না। ওদুদকাকাকে দেখছি না।

কী করে দেখবে! নিরপরাধ মেয়েটাকে এ-ভাবে কেউ গাল দেয়। সুহাসিনী তুই তার মাথা চিবিয়ে খাস না—ইদানীং তোমার মায়ের তিরস্কার বড়ই প্রখররূপ ধারণ করেছিল।

ওরা কোথায়!

ওরা চলে গেছে।

কোথায়?

তা তো জানি না। তুমি থাক না বাড়িতে, তোমার মা ইদানীং বড়ই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। তোমার মা যা মুখে আসত তাই বলে অপমান করতেন সুহাসিনীকে। নানা কুৎসিত কথাও উচ্চারণ করতেন। সামান্য আত্মসম্মান থাকলে কেউ এ বাড়িতে থাকে না। চলে যায়। ইদানীং সুহাসিনীর শরীর ভালো ছিল না, খাওয়ায় অরুচি, বোধ হয় ঘুম কম হত। স্বপ্নে সারদামা ডালিমফুল না তিল ফুল দিয়ে যায়। সেই নিয়ে কী অশান্তি। সে নাকি ওটা বালিশের নীচে রেখেছিল, তার নাকি স্পষ্ট মনে আছে—বালিশের নীচে থেকে স্বপ্নাদ্য ফুলটি তোমার মাই চুরি করেছেন—কী বলব, কেন যে এসব হচ্ছে জানি না। ওদুদ কোত্থেকে শেষে একটা ডালিম ফুল এনে গোপনে না রেখে দিলে সুহাসিনী আমাদের আর এক ঘোর অশান্তিতে ফেলে দিত।

মিহিরের হাত পা অবশ হয়ে আসছে যেন। কোথায় গেল মেয়েটা, ওদুদকাকা তাকে কোথায় নিয়ে গেলেন।

কী করে জানব! সকালে উঠে দেখি দু'জনের একজনও নেই। নেই। নেই।

মা কেমন অপরাধী মুখে বললেন, হাতমুখ ধুয়ে কিছু মুখে দে বাবা। এই নীহার তোর দাদাকে এক বালতি জল দে। হাতমুখ ধুয়ে কিছু মুখে দিক।

সে বাড়ি এসে গেছে জানলে, সকালে নিশ্চয়ই কেউ কেউ দেখা করতে আসবে—কিন্তু সুহাসিনীর কী হবে! সে ছুটে চালতা গাছটার নীচে গিয়ে ডাকল, নীলু, নীলু।

নীলু দৌড়ে এসে বলল, বড়দা তুমি ডাকছ।

শোন।

তার গলা কাঁপছে। উত্তেজনা সৃষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছে। ডাক্তারবাবুদের মানা আছে—কোনই যেন উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

বারান্দায় ক্ষীরোদ সান্যাল প্রমাদ গুনছেন। কী করবেন তিনিও বুঝতে পারছেন না।

তখন নীলু বলল, বড়দা কাকিমা যা করল!

কী করেছে বলবি তো!

জান তো কাকিমা খেপে গেলে মাথা ঠিক থাকে না। সুহাসিনীকে ঠেঙিয়েছে—তুই মেয়ে জানিস না কী হয়! তুই নিজের কথা ভাবলি না! তোর গোঁসাইবাবার কথা ভাবলি না। মরে যা মরে যা, তুই। আমার কোন্ অভিশাপে এটা হল—আমি কী করব! তুই রাক্ষসী, তুই ডাইনি।

মিহির গুম মেরে গেল। সে জানত, এরকমেরই কিছু একটা হবে।

সে নিজেকে যথেষ্ট সংযত রাখার চেষ্টা করছে—সে তো আর হাউ হাউ করে কাঁদতে পারে না।

সুহাসিনী কিছু বলে যায়নি তোকে।

না।

যদি পাকিস্তানে চলে যায়।

পাকিস্তানে যাবে কেন?

যেতেও তো পারে।

শোনো বড়দা সুহাসিনীকে ওদুদকাকা খুব ভয় পায়। একবার যদি সে ওদুদকাকাকে বলে—যামু গিয়া দু চক্ষু যেদিকে যায়, ব্যস ওদুদকাকার পিলে হলুদ। সুহাসিনী নিজেও যাবে না, ওদুদকাকাও যাবেন না। তারা দেখবে এ-দেশেই কোথাও একটু জায়গা করে নেবে।

মিহির কিছুটা আশ্বস্ত হল নীলুর কথায়। এ দেশে থাকলে সে ঠিক খুঁজে বের করবে।

মিহির চলে এসেছিল।

তখনই ফের নীলু ওদের বাড়ি থেকে দৌড়ে আসছে।

দাঁড়াও বড়দা।

সে দাঁড়াল।

আর কী খবর দেবে নীলু সে জানে না।

নীলু বলল, সুহাসিনী আমাকে এটা দিয়েছে।

কী!

তোমার ঘরের চাবি। তোমার ঘরে ও তালা দিয়ে গেছে।

সে বারান্দায় উঠে বলল, আমি খাব না মা। আমার খেতে ইচ্ছা করছে না।

ক্ষীরোদ সান্যাল বললেন, যা কিছু ঘটে মনে রাখবে সব তেনারই ইচ্ছে।

তাঁর চোখের বাইরে আমরা কেউ নই। না খেলে কি সমস্যার সমাধান হবে।

সেই এক সোমনাথদার কথা। এই গ্রহের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর মানসপুত্রের বেঁচে থাকার জন্য। প্রাণ সৃষ্টির একটাই হেতু।

জ্যোৎস্নায় সারা বাড়ি ডুবে আছে।

নীহার বলল, তোর সঙ্গে আমি আজ শোব।

কেন!

মা বলল।

বলুকগে।

সুহাসিনীদি নাকি তোর ঘরে তালা দিয়ে গেছে।

ঘরের চাবি আমার কাছে আছে।

ক্ষিরোদ সান্যাল বসেই আছেন। সুহাসিনী না থাকায় বাড়িটা এই জ্যোৎস্নায়ও যেন অন্ধকার হয়ে আছে। গৃহদেবতার বৈকালি দেবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তবু তিনি উঠতে পারছেন না। কোথায় গেল ওদুদ মেয়েটাকে নিয়ে।

যা গেল ক'দিন।

ক্ষীরোদ ক্ষিপ্ত হয়ে সেদিন বলেছিলেন, তুমি এটা ভালো করলে না ধনবউ। আমি তো ওর কোনও দোষ দেখি না। ও রাক্ষসী কেন হবে। ও ডাইনিও নয়। আসলে সুহাসিনী দেবী। ক্ষীরোদ তাঁর কথার গাম্ভীর্য রাখতে অনেক সময় ইংরাজি বাক্য ব্যবহার করেন—সুহাসিনী ভেরি জেন্টল অ্যান্ড কাউন্ড।

রাখ তোমার দেবী। দেবীর তাণ্ডবে এখন আমরা অস্থির। স্বপ্নাদ্য ফুলটা নাকি হারিয়েছে। ওর সন্দেহ ওটা নাকি আমি চুরি করেছি। বল রাগ হয় না? কখনও বলছে সারদা মা, কখনও বলছে মা মেরি। আবার সুবচনী দেবীর কথাও বলছে।

ক্ষীরোদ বলেছিলেন, স্বপ্ন সব দেয়। স্বপ্নে সব পাওয়া যায়। দেশে থাকতে স্বপ্নাদ্য ওষুধে তোমার সুতিকা রোগ সেরে গেল না! ভুলে গেলে?

মহামায়া বলেছিল, আর কিছু বলবে?

না।

ঠিক আছে।

আর তখনই ক্ষীরোদ সান্যাল কেন যে ফের বলেছিলেন, মহামায়া, সুহাসিনী কিন্তু তোমার পুত্রের মায়ায় জড়িয়ে গেছে। সেই মায়া বড় কঠিন। তার ছোটাছুটি দেখে বোঝো না? না হলে মহাদেবের দোকানে একা সে চলে যায়।

বাড়িতে চিঠি না দিক, মহাদেবের নামে তার যদি চিঠি আসে। সুহাসিনীর বিষাদ লক্ষ করবে না। সে স্বপ্নাদ্য ফুল পায় কেন বুঝবে না। পেয়ে আবার হারায়। তুমি না মা!

তিনি তো ওদুদকে বলতেও পারেন না। আমার ধর্মে হাত দিচ্ছে সুহাসিনী। তুই তাকে নিয়ে দেশেই ফিরে যা। বললে যে ওদুদ অথৈ জলে পড়ে যাবে।

যাবে তো যাবে। আমাদের কি! তাই বলে সুহাসিনী আমাদের জাত মারবে। দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা! সে এত সাহস পায় কী করে। তার চেয়ে ওদুদ ওকে নিয়ে পাকিস্তানেই চলে যাক্।

এটাও ভাবলেন ক্ষীরোদ। পাকিস্তানে চলে যাবে? গেলে মেয়েটার কি ইজ্জত থাকবে। আর যদি তার গৃহে প্রকৃতই আগুন ধরে যায় তখন কী হবে? গোস্বামী বংশে এত বড় কেলেঙ্কারী। অনূঢ়া মেয়ে বাড়িতে গর্ভবতী। তাও আবার নিম্ন বর্ণের মেয়ে।

প্রথমদিকে ক্ষীরোদ সান্যালও বিশেষ গুরুত্ব দেননি। মিথ্যা অভিযোগ করে সুহাসিনীকে খাটোও করতে তার মন চায়নি। মাথায় কিছুটা পাগলামি ঢুকেছে। ফুল খুঁজে বেড়াচ্ছে, বেড়াক। মেয়েটা শুচিবায়ুগ্রস্তও হয়ে যেতে পারে, এতেও গোঁসাইবংশের উদ্ধার পেয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। আর তা ছাড়া যদি অন্যত্র কোথাও নিয়ে গিয়ে মেয়েটার বিবাহের একটা বন্দোবস্ত করা যায়!

এই যে ধনবউ।

বল।

ভাবছি বড়দার সঙ্গে কথা বলি। দাদা কংগ্রেস অফিসে যাওয়া আসা করেন—

তোমার কি মাথা খারাপ! বাড়ির কেলেঙ্কারী দশকান না করলে দেখছি তোমার ভাত হজম হয় না।

একটু বেশি রাতে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন ক্ষীরোদ—সহসা চোখে পড়ল ঠিক তালগাছটার আড়ালে কে দাঁড়িয়ে আছে।

কে?

আমি গোঁসাইবাবা।

তুই এখানে কী করছিস।

আমি খুঁজছি।

কী খুঁজছিস?

সুহাসিনী ঘাস পাতা সরিয়ে সত্যি যেন কিছু খুঁজছে।

এ তো মাথা খারাপের লক্ষণ।

যা ঘরে যা।

সুহাসিনী চলে যাচ্ছিল, ডাকলেন, শোন সুহাসিনী। কাছে এলে শরীরে কী যেন পর্যবেক্ষণ করলেন।

মেয়েটা এমনিতেই কিছুটা রোগা, অথচ হাতে পায়ের সর্বত্র যেন কোমল এক সৌন্দর্য বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। নবীন, পত্রপুষ্পের মতো তার শরীর। কোমর বাঁকিয়ে, সারা শরীর আঁচলে ঢেকে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলে শিল্পীর টানের মতো এঁকেবেঁকে কামোদ্দীপক সুহাসিনী। স্বর্গচ্যুত কোনও নটি যেন মর্তে হাজির। শরীরের উদ্ভাস এত মোহময় হতে পারে! যেন অনঙ্গদেবও প্রার্থী হয়ে আছেন শরীরে। এবং সুহাসিনীর শরীরে নারীর লাস্যময়ী কুহকের যেন বিন্দুমাত্র অভাব নেই—সেদিনই প্রথম ক্ষীরোদ সান্যাল উপলব্ধি করেছিলেন এই মেয়ে বড়ই আগুন হয়ে আছে।

তারপর তাঁর মনে হল এ কী রূপ দেখলেন। চোখ তুলে আর তাকাতে পারছিলেন না। বিধাতা নিজেই এই নারীর মধ্যে পাগল হয়ে থাকলে মিহির তো কোন ছার—সুহাসিনী কবে থেকে এই রূপের অধিকারী হল, এ-ভাবে তার দাঁড়াবার ভঙ্গি কার নির্দেশ, নারী যে প্রলয়ঙ্কারী এই ভঙ্গির মধ্যেই যেন আছে তার প্রকাশ—হাঁটাহাঁটিতে নারীর যোনিদেশ যে চেপে থাকে, কিছুটা ফাঁক করে এক পায়ে ভর করে অন্য পা সামান্য দূরে সরিয়ে যোনিমুখ কিছুটা হালকা করে রাখা যেন—এক কামার্ত নারীর এ-ছাড়া যেন আর কোনও উপায় নেই। তিনি স্থির থাকতে না পেরে সেই আদিম ভৌতিক এক জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়েই বললেন, তুই যা।

সুহাসিনীর দিকে তাকাতে কেমন ভয় পেলেন।

ফের বললেন, তুই যা। তুই মা রম্ভা, তুই মা মেনকা, স্বর্গচ্যুত নারী। তুই আশীর্বাদী ফুল পেতেই পারিস। খুঁজলে ঠিক পেয়ে যাবি।

তারপরই সহসা যেন সংবিৎ ফিরে এল, মহামায়ার কথায়— মিহিরকে বল হাতমুখ ধুয়ে যেন খেয়ে নেয়। কত রাত হয়েছে তোমাদের কি হুঁশ আছে।

মিহির কোনও কথাই বলছে না।

মিহির খেতে বসে সামান্য ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল। সবার সামনে সে আর থাকতে সাহস পাচ্ছে না। কথা বললেই অশ্রুসিক্ত হয়ে যাচ্ছে চোখ।

পাঁচ

আরে পা চালাইয়া হাঁটেন মাইয়াখান। অনেক দূর যাইতে হইব। কারবালার ভাঙা পরিত্যক্ত মসজিদে রাত কাটাইতে হইব। আপনের লাগে পরামর্শ করতে হইব।

সুহাসিনী সামান্য পেছনে পড়ে গেছে। সে খুব সতর্ক হয়ে আছে। হাতের টোফায় ডালিম ফুল—সারদা মায়ের অসীম কৃপা। তার স্বপ্নাদ্য ফুল শেষমেশ আবার ঘরের এক কোণায় খুঁজে পেয়েছে। কেউ বিশ্বাসই করল না, স্বপ্নে ফুল সত্য হয়। ফুলটা পাওয়ার পর মনে হয়েছে, সে আর একা নয়। মা সারদা তার সঙ্গে আছেন।

ফুলটা পাওয়ার পর সে নানাবিধ পূজা আর্চার আয়োজন করেছিল।

প্রথমেই সে তার গোঁসাইবাবাকে বলেছিল, আমি আজ উপোস করব। আজ আমার ব্রত আছে।

সে তার গোঁসাইমাকে বলেছিল, গোঁসাইমা, আমার অপরাধের শেষ নাই। না হলে বাবা মা আমাকে অস্বীকার করবে কেন। আপনের মাথা গরম হইয়া যায় জানি। আমার ভবিষ্যতের কথা ভাইবাইত আপনের মাথা গরম হইয়া গ্যাছে।

মহামায়া যে কি বলেন!

তবু বললেন, যা খুশি কর। তবে কিছুই বলছিস না। মুখ চেপে আছিস। দেখি কতদিন মুখ চেপে থাকতে পারিস।

সুহাসিনীর মুখে তখন আশ্চর্য সুষমা—তার তো মায়ের আশীর্বাদ ভরসা। তার আর ভয় থাকবে কেন।

তারপরই ওদুদকে ডেকে বলেছিল, আমারে নতুন ঘট, নতুন সরা আইনা দেন। ফল মূল, গুড়ের বাতাসা লাগে। সে তারপর প্রাতঃস্নান সেরে শুচিশুদ্ধ হয়ে সারাদিন দেবী সারদাদেবীর সামনে চোখ বুজে উপাসনা করেছে। ভোগ নৈবেদ্য ধূপ দীপ জ্বালিয়ে মা সারদাকে অনুভব করার চেষ্টা করেছে। ঘট সরায় সে সিঁদুর লেপে সারদাদেবীর প্রতিকৃতি নির্মাণের চেষ্টা করেছে। এবং পবিত্র এক আধার নির্মাণ করার চেষ্টা করেছে। ডালিম ফুলটি, ঘটের মধ্যে রেখে সরা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। তারপর আতপচাল মিহি করে বেটে উপরে লেপে দিয়েছে।

জরায়ুর জলে তিলফুল ভাসে। এই বলে সে গুন গুন করে গানও

গেয়েছিল— জোড়হাত করে হত্যে দিয়েছিল ঘটের সামনে। ধূপ দীপ এবং নৈবেদ্যর ফলমূলের ঘ্রাণে এবং সারদাদেবীর আশীর্বাদে প্রাণ সঞ্চার হোক ফুলে। ছোটগোঁসাই আপনিই আমার ত্রাতা। আপনি না থাকলে এই অবলম্বন কোথায় মিলত। আপনার পবিত্র বারি আমি বহন করছি। তাতে ছোটগোঁসাই প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে। সেই এক বিস্ফোরণ—আপনার কাছেই পৃথিবীর জন্মরহস্য জেনেছি—বিগব্যাং অথবা অতিকায় বিস্ফোরণ— আপনার ভালোবাসা আমার জরায়ুর অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আমি জননী হতে যাচ্ছি। আমার আর ভয় কী। অবলম্বন মিলে গেছে। এখন আমি আর একা নই। আমি আমার সন্তান—।

সুহাসিনী দ্রুত হেঁটে ওদুদের কাছে যেতে চেষ্টা করছে। মানুষটার পয়মাল চেহারা—ছয় ফুটের ওপর লম্বা। সারা মুখে লম্বা কাঁচা পাকা দাড়ি। পরনে লম্বা আলখাল্লা—আর মাথায় সেই পেটি, হাতে বদ্‌না। বাপের বয়সি মানুষ, মিঞাসাবকে দেখলে ডর লাগার কথা। অথচ কী নরম মন, এক কথায় তাঁর সঙ্গে বের হয়ে এসেছেন। গভীর রাতে সে তাঁকে ডেকে তুলেছিল। বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার আগে নিজের ঘরে বসে নতুন একখানা সিল্কের শাড়ি পরেছে। মাথায় ঘোমটা দিয়ে মুখখান বার বার আয়নায় অবলোকন করেছে। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। সে তো আর শুধু সুহাসিনী নয়, সে তাঁর গোঁসাইবাবার পুত্রবধূ। কেউ স্বীকার না করুক, গোঁসাইমা তাকে শাসন করতে হাতে চেলাকাঠ নিয়ে যতই তাড়া করুক—যাই করে থাকুক, সে নিজে জানে ছোটগোঁসাই ফিরে এসে তাকে না দেখতে পেলে পাগল হয়ে যাবে।

তার কপাল।

না হলে সিঁড়ি থেকে তিনি পড়ে যাবেন কেন?

মহাদেবদা, আর নীহার তাকে আনতে গেছে।

সে ওদুদের কাছে গেলে, তিনি টর্চ জ্বেলে মুখ দেখলেন। একেবারে দেবীমুখ। তিনি দেখলেন, সুহাসিনীর হাতে সেই ঘট-সরা, বুকে জড়িয়ে রেখেছে।

এটা আবার নিলেন ক্যান—কোথায় যামু ঠিক নাই—রাস্তাঘাটে আপদেরও শেষ থাকে না, টোফার মধ্যে আছেটা কী।

আমার আত্মা আছে বাবা। তারে ছাইড়া আমি যাই কি কইরা কন।

আজই সে ওদুদকে ঘরে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছে। বলেছে, আপনি আমার পিতার অধিক। গোঁসাইবাবার কাছে নিয়া না আইলে আমি জননী হইতে

পারতাম না। আপনে আমার লগে চলেন—যে দিকে চক্ষু যায় যামু গিয়া।

আরে এইডা আপনে কী কইতাছেন! জননী হইলে কী হয় জানেন! গোঁসাই বংশের কলঙ্ক হয়। খবরদার কেউ যেন না জানে।

সুহাসিনী বলেছিল, বাবা আমি যে বড়ই আতঙ্কে পইড়া গেছি। গোঁসাইমা সব জানতে পারলে আমার রেহাই থাকব না। গর্ভপাত না কইরা ছাড়ব না। আমি কোন্ ভরসায় এইখানে থাকি কন। আমার শেষ অবলম্বন—কিছু একটা হইলে পাগল হইয়া যামু।

এই কথায় তটস্থ ওদুদ জানে দু'বছর ধরে তিনি তার বাবা-মা-র খোঁজে ঘুরেছেন, সুহাসিনীকে ভালোই চিনেন। এখন মানে মানে তারে নিয়া নিখোঁজ না হইয়াও উপায় নাই। মাইয়াখানের এমন কথায় তার যা মনে উদয় হইয়াছিল—যার মুখখানা চোখের উপর ভাইসা উঠছিল—তা হল নিলোফারের মুখ। ভৈরববাজারে দাঙ্গার সময় নিলোফার বিষ্ণুপদকে বাঁচাবার জন্যই পালিয়ে এ-দেশে চলে আসে। সারা রাস্তায় অর্থাৎ বর্ডারের আগে পর্যন্ত নিলোফার বোরখায় মুখ শরীর ঢাইকা রাখছিল। বর্ডার পার হয়েই নিলোফার সেই যে বোরখা খুইলা ফেলল আজও তাইন বোরখা খোলাই রাখছে। বোরখা পরনের আর দরকার হয় নাই।

নবদ্বীপ ধামের কাছে নদী পার হইতে হয়। সেই নদী পার হতে গিয়া বিষ্ণুপদ কইল, নিলোফার আর বেশি দূরে যাইয়া কাজ নাই। ঘাট থেকে ওঠার মুখে একখান ডাল ভাতের হোটেল খুলতে পারলে আমাদের জীবন একভাবে না একভাবে চইলা যাইব।

নিলোফার তুই রাজি কি না ক?

আপনে যা স্থির করবেন তাই আমার স্থির করতে হইব।

ভাঙা মসজিদে ঢুকে সব খুলে বললেন ওদুদ। সকালের ফাস্ট প্যাসেনজার ধইরা কাম নাই। ক্ষীরোদ ভাই খুঁজতে বাইর হইলে, কিংবা কলোনির লোকজন খবর পাইলে আমাদের ঘিরা ধরতে পারে। একটা দিন এই বনজঙ্গলের মসজিদে রাত কাটাইয়া দিমু। তারপর সুযোগ বুইজ্যা বাইর হইয়া পড়মু। একমাত্র নিলোফারই পারে আমাদের রক্ষা করতে। আপনার বাবা হারাণ পালেরে খুঁজতে গিয়া নদীর পাড়ে আলাপ। খিধা পাইছিল—নদীর ঘাট পার হইয়া বিষ্ণুপদর হোটেল, ছিমছাম—সনের চাল, আর ঘুনিবাঁশের বেড়া। খুব চালু হোটেল। হিন্দু মুসলমান সকলেই আহার করে। কেউ জানেই না নিলোফার মুসলমানের মাইয়া। নির্বিবাদে সবাই আহার করে—আমি মুসলমান, তাঁর যেন

ভয় নাই—কইল বাবা, আর একটু মাছের ছালোন নেন। আর যায় কই, কইলাম তুই মাইয়া মুসলমানের বেটি। নিলোফার লজ্জায় জিভ কাইটা বলেছিল, আপনে আমার দেশের লোক। আসমানদিচরের মসজিদের ইমাম। আমার দেশে আপনারে কে না চেনে কন্। আমি ত ধরা পইড়া গ্যালাম।

মিহির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল।

টেবিলে হারিকেন জ্বলছে।

তার ভিতরের হাহাকার আর বাঁধ মানল না।

সুহাসিনী চলে গেছে। অথচ ঘরের সব কিছু এত পরিপাটি যে তাকে স্পর্শ করা যায়। টেবিলের বইগুলো তেমনি সাজানো। তার বিছানায় চাদর বালিশ এবং লেপে সেই একই যত্নের ছোঁয়া।

সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকল। চোখের জলে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। সেই চাঁপা ফুলের গন্ধ। সুহাসিনীর শরীরের ঘ্রাণ চাদরে বিছানায়। তারপরই মনে হল, সুহাসিনী যদি কোনও চিঠি রেখে যায়। সুহাসিনী দরজায় তালা দিয়ে গেছে। চাবি নীলুর কাছে রেখে গেছে—তার জন্য কোনও খবর রেখে গেছে হয়তো।

সঙ্গে সঙ্গে মিহির খুবই তৎপর হয়ে উঠল—গোপনে কি লুকিয়ে রেখে গেছে—কোনও খবর—সে কোথায় গেছে ওদুদকাকার সঙ্গে। সে কোথায় গিয়ে উঠেছে, এই সব খবর যদি সে রেখে যায়।

বালিশের নীচে।

না কিছু নেই।

তোশকের তলায়, না কিছু নেই।

কিছু খবর তার জন্য সুহাসিনী নিশ্চয় রেখে গেছে—সে তালা লাগিয়ে গেছে। বাড়ির অন্য কারও হাতে যেন না পড়ে। সব কিছু প্রকাশ না হয়ে পড়ে—

তারপরই বইগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে চিঠিটি বের হয়ে পড়ল।

কী সুন্দর হস্তাক্ষর।

হারিকেন উসকে, দরজা বন্ধ করে—প্রথমেই পড়ল। শ্রীচরণ কমলেষু।

ছোটগোঁসাই আপনি ফিরে আসার আগেই আমি আবার বের হয়ে পড়েছি। কোথায় যাব জানি না—যেখানেই যাই আমাদের সন্তানের আর কোনও অকল্যাণ হবে না। আমার সঙ্গে ঈশ্বর আছেন। স্বপ্নাদ্য ফুলটি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি যেখানেই থাকি আপনি আমার সঙ্গে আছেন। আপনি ছাড়া আমার আর কেহ যে নাই। ঈশ্বর, আমি আর ওদুদকাকা— যিনি আমার পিতার অধিক এবং আমাদের সন্তান—এই সব মিলে আমার নতুন গ্রহ। কোনও কারণেই আপনি আমার খোঁজ করবেন না। গোঁসাইমা, গোঁসাইবাবাকে কষ্ট দিতে চাই না। এখন আপনাদের সবার আশীর্বাদ বাঞ্ছনীয়। ইতি, সুহাসিনী দাসী।

পুনশ্চ— প্রাণই ঈশ্বর।

ছয়

তার যে মাঝে মাঝে কী হয়!

নিজেকে নিয়ে সে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করে।

অফিসে যাবার সময় কিংবা ফেরার সময় ভিড়ের বাসে তাকে উঠতেই হয়। অথবা কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গেলে বাসে না উঠেও উপায় তার থাকে না। এত ভিড় যে গা বাঁচিয়ে ভেতরে ঢোকাও কঠিন। সে বাসে উঠেই ঠেলে-ঠুলে কোনওরকমে মাঝখানটায় চলে যেতে চায়। মাঝখানে গেলে দরজার ঠেলাঠেলি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। নারীজাতির এখন বিশেষ উন্নতি হয়েছে। তারা প্রতিবাদ করতে শিখেছে।

সেতো টেরও পায়নি মেয়েটি রড ধরে উবু হয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। বাইরের দৃশ্য দেখতেই পারে।

সে কোথায় এল, কোন্ স্টপেজে থামল, ভিড়ের বাসে বোঝাও কঠিন। তার অর্থাৎ মিহিরের একটাই উপায়। বাসের মাঝখানে থাকতে পারলে ঝাঁকুনি কম লাগে।

কারও ওপরে পড়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে না। শক্ত করে রড ধরে রাখলে যতই বাসের ঝাঁকুনি থাকুক না কেন, সিটের মাঝ বরাবর থাকার একটাই সুবিধা, বাসের নানারকম অসম্মান অপমান থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সে অবশ্য এত দ্রুত সিট দখলের জন্য ভেতরে [illegible]র চেষ্টা না করলেই পারত।

মেয়েটির কোমরে হাত লাগার সম্ভাবনা [illegible] না।

নিজের এই বেকুবির জন্য চুপচাপ ভেতরে ঢুকে অপমান সহ্য করে গেল। তবে মেয়ে কাকে বলছে বোঝা যাচ্ছে না। অসভ্য ইতর, বাড়িতে কী মা বোন নেই—এই কথাগুলি সে শুনতে পাচ্ছিল আর আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে

যাচ্ছিল—মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে বলছে না, তবু সে জানে তাকেই বলছে।

সে নিজে নিজে বলছিল, এতটা বেহুঁশ হওয়া আমার উচিত হয় নি। অবশ্য এটাও ঠিক, বাসের এই গাদাগাদি অবস্থায় মেয়েদের আত্মসম্মান রক্ষা করাই দায়—যাদের এই ভিড়ের বাসে ওঠার অভ্যাস আছে, সামান্য স্পর্শে তারা বিহ্বল হয় না। বসে উঠলে ঠ্যালা খেতে হবে জেনেই যেন ওঠা।

কিন্তু বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা না থাকলে, শরীর ছাঁত করে জ্বলে উঠতেই পারে। শত হলেও নারীজাতি, তার মান অপমানবোধ পুরুষের তুলনায় বেশি তো হবেই। আর সবাইতো ধোওয়া তুলসী পাতা নয়। বাসের এই ঠেলাঠেলিতে সুযোগ বুঝে যে যার মত উত্তাপ নেবার চেষ্টা করে।

শুধু বয়সী লোকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। যে সুযোগ পায় তারই এই কামনার বশীভূত হতে হয়। তবে কেউ কেউ আত্মসম্মান রক্ষার্থে নিজেকে যতটা পারে বাঁচিয়ে চলে। অধিকাংশ যাত্রীরই এই অবস্থা। এত কাছে, এত গা ঘেষাঘেষি, যা অবস্থা হয় মাঝে মাঝে আর ঠেলা খেলেই ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাতে শরীরের বিশেষ অঙ্গ এত নাগালের মধ্যে এসে যায় যে উভয়ে সরতেই পারে না। সংলগ্ন হয়ে থাকারও স্বভাব আছে নারী পুরুষের।

সে নিজেকেই দায়ী করছে।

এই দ্রুত উঠে আসা এবং দ্রুত সিট দখলের চেষ্টায় সে বোধ হয় কিছুটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

মেয়েটির মুখ দেখতে পাচ্ছে।

মেয়েটি মাথা নীচু করে রেখেছে।

এবং ভাবতে পারে, ছিঃ ছিঃ সে এটা কী করল। বাসের সব লোক এখন মজা পাচ্ছে।

একজন বলল, দিদি কি হয়েছে!

মেয়েটি নিজের বিহ্বলতায় বলল, কিছু না। কিছু হয়নি।

তার এমনও মনে হতে পারে, সব পুরুষমানুষই কামুক এবং ইতর। তারপরই দেখেছিল, মেয়েটি সিট থেকে উঠে স্টপেজে নেমে গেল। যাক্। সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

বাঁচা গেছে।

রাম ধোলাইর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

এবং তার মনে হল, আর কতটা সন্তর্পণে উঠলে মুরগির মত শরীর উঁচিয়ে রাখা মেয়েটির গালাগাল থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারত।

খাল ধারে তার স্টপেজ। সেখান থেকে কিছুটা হেঁটে গেলেই তার অফিস। খবরের কাগজে যে ডেসকে কাজ করে। অফিস ডিউটি তার সপ্তাহে সপ্তাহে বদলায়—আবার কখনও মাসের পর মাস একই ডিউটি—তবে তার মনে হয়েছে ভিড়ের বাসে তার মত মানুষের পক্ষে ওঠা ঠিক নয়। তবে কার ওপর দিয়ে যাবে, তাও বলা যায় না, জীবনে এই প্রথম এমন একটা বিচ্ছিরি পরিস্থিতিতে পড়ে আত্মগ্লানিতে সে ডুবে যেতে থাকল—সে কি সত্যি লক্ষ্য করেনি, জানলার পাশে লেডিস সিটের সামনে বসার জায়গা না পেয়ে এক যুবতী রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে—অথবা সে বাসের দরজা অতিক্রম করে ডানদিকে তাকাতেই কী সে বুঝেছিল, উটের মত মুখটি তুলে এক শরীর তার দিকেই লক্ষ্য করে আছে।

যেন কামনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আছে।

লোভে পড়ে তার অজান্তেই সে হাতখানা এগিয়ে দেয়নি কে বলবে! আসলে বিশ্বাসঘাতক তার এই হাত।

মেয়েটির তো মিছে কথা বলার কথা নয়—অথচ সে নিজে বিশ্বাস করে তার মত লোকের পক্ষে এমন ইতরকাজ শোভা পায় না।

আবার কেন যে মনে হয় এটা অন্য কারও কাজ—মেয়েটি তো জানলায় কিছুটা মুখ বাড়িয়ে রেখেছিল, সে দেখবে কী করে পেছন দিয়ে কারা বাসে উঠে যাচ্ছে।

তবে গালাগাল তাকে যে দিয়েছে কারণ মুহূর্তে মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকে দেখছিল।

আরে আমি কি করলাম!

এমন ভাবলেও সুড় সুড় করে সে তার মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। এত কী অপরাধ যে এমন এক জ্বলন্ত চোখের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখতে হল। মেয়েটি কি বিবাহিত।

না কি এখনও বিয়ে হয়নি।

বিয়ে হলে, এত শুচিবাই থাকার কথা নয়। কিন্তু সে যে আর তাকিয়ে দেখতেই পায়নি মেয়েটির মুখ।

মেজাজটা তার খিচরে গেছে।

সামনে হেঁটে গেলেই পাঁচ রাস্তার মোড়।

সে সোজা না হেঁটে বাজারের গেট দিয়ে ঢুকে রাস্তা সর্টকার্ট করল। অফিসে গিয়ে কি দেখবে কে জানে। ডেস্কে দুটি নতুন মেয়ে জয়েন করেছে।

মালিকপক্ষের লোক। দেরি হলে লাগানি ভাঙানি হতে পারে। মেয়ে দুটো কাজ করছে, না শিক্ষানবিশী চলছে—নিউজ—এডিটর নিরুপমদাকে বার বার জিজ্ঞেস করেও জানতে পারে নি। বাসের আত্মগ্লানি থেকে রক্ষা পাবার জন্যই যেন সে আরও দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করল। বিকেলের ডিউটিতেই যত কাজের চাপ—রাত এগারোটার মধ্যে প্রেসে সব খবর পাঠিয়ে দিতে হয়। টেলিপ্রিন্টার থেকে অজস্র ক্রিড নামবে। এখন আবার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে। তার কাজ টেবিলে টেবিলে খবর গোছগাছ করে পাঠিয়ে দেওয়া। দু একটা খুচরো খবর সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরও তার করার দায় থাকে। মেয়ে দুটো কিংবা রমেন যদি এবং আর যাঁরা আছেন সবাই মিলে কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখে—আবার সেই মেয়েটির মুখ—গ্লানির আর শেষ থাকে না। এবং তার যে প্রকৃতই দেরি হয়ে গেছে, ঘড়ি দেখে টের পেল।

বাড়িতে কি মা বোন নেই!

তার মাথা এভাবে হেঁট হয়েছে কখনও, সে জানে না। একটি প্রথম শ্রেণী কাগজের সে দায়িত্বপূর্ণ কাজ সামলায়—আর মেয়েরা মিহিরদা বলতে অজ্ঞান—সেই লোকটার এমন আধোগতি—মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে—তার যে অফিস আছে সে-কথাই মনে থাকছে না।

সুহাসিনীর কথা কতদিন পর মনে পড়ল।

সুহাসিনীর কাছেই নারী সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা নির্মাণ তার।

সুহাসিনী।

কোথায় যে পালাল।

কারণ সে আরোগ্য লাভের পর বাড়ি ফিরে জেনেছে—সুহাসিনী ওদু কাকার সঙ্গে কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেছে। একটা চিঠি অবশ্য তার জন্য বালিশের তলায় রেখেছিল—লেখা তাতে, ছোটগোঁসাই এতদিন আমার অবলম্বন ছিল না—এখন আমি সন্তানবতী হয়েছি —আমি আর এই পৃথিবীতে একা না। তুমি আমার জন্য ভেব না। আমি চলে যাচ্ছি—ওদুদ মিঞার সঙ্গে। তিনি আমার পিতার চেয়েও অধিক। সুহাসিনী আরও লিখে গেছিল, তুমি আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছ।

এই সব কথার স্মৃতি মনে উদয় হতেই তার স্থির ভাবনা, সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ইতর কাজ করতে পারে না। কারণ সুহাসিনীর সে প্রেমিক—কিংবা বলা যায়, সুহাসিনীর গভীর প্রেম তাকে নিষ্ঠা কি বস্তু শিখিয়েছে। ওদুদ কাকা একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান—বাবার বয়সী মানুষটা সুহাসিনীর ইজ্জত রক্ষার্থে, তার

আত্মীয়স্বজনের খোঁজে ছিলেন, মা-বাবার খোঁজে ছিলেন। মসজিদের ইমাম তিনি, তাঁর মসজিদের কুয়োতলায় ভোরের কুয়াশার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন সুহাসিনীকে। বেহুঁশ—কোথাও দাঙ্গা হচ্ছে—দাঙ্গার মধ্যে পড়ে আত্মরক্ষার্থে সুহাসিনী ছুটছিল। দিকবিদিক জ্ঞান ছিল না।

মসজিদের ইমাম সাব দেখে হায় হায় করেছেন।

মেয়েটি কোনও হিন্দু কন্যা যদি হয়!

কুয়াশার মধ্যে বেহুঁশ বালিকাকে বালতি বালতি জল মাথায় ঢেলে হুঁস ফিরিয়ে এনেছিলেন, তারপর মসজিদের পেছনে তাঁর জঙ্গলের ডেরায় তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা সুশ্রুষা করেছেন, কিন্তু কাউকে গাঁয়ে খবর দেননি। সময় ভাল না, আর মানুষের মধ্যে ভালমন্দ দুই শ্রেণীর লোকই থাকে—

তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন নিজেই রাইপুরায় যাবেন, এবং খোঁজ নেবেন সুহাসিনীর বাবা হারান পালের কী খবর। দু-দিন ধরে এই গ্রামে তাদের বাড়ি দাঙ্গায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ছাই হয়ে গেছে, বেঁচে আছেন কি আগুনে পুড়ে মরেছেন সুহাসিনীর বাবা মা, তার খবরও শেষ পর্যন্ত জানা যায়নি। সেই সুহাসিনী শেষে এ-পাড়ে হাজির।

না এলেই ভাল হত—এমন মনে হচ্ছে মিহিরের। সুহাসিনীর কথা মনে হলেই তার মধ্যে একরকমের অস্থিরতা জন্মায়। তার বাবা ক্ষীরোদ সান্যালের খোঁজে ওদুদ কাকা শেষে এ-পাড়ে এসে হাজির। ওদুদ কাকার বিশ্বাস মিতা ক্ষীরোদ সান্যাল সুহাসিনীর একটা সুব্যবস্থা করবেনই। একবার তার হাতে তুলে দিলে, তার দায় শেষ হয়। তবু কি যে থাকে, বালিকা সুহাসিনীকে রেখে তিনি আর তার দেশে ফিরতে পারেন নি, স্নেহ মায়া মমতা বড়ই বিষম বস্তু।

ওদুদ কাকা একা মানুষ। মেয়েটি তার কাছে থাকতে থাকতে কখন প্রাণের ধন হয়ে গেল তিনিও টের পাননি। সেই সবে ধন সুহাসিনীকে ফেলে তার আর দেশে ফিরে যাওয়া হয়নি। মিহির জানে তার পিতাঠাকুরের পরামর্শেই ওদুদ কাকা এ-দেশে থেকে গেছিলেন। শত হলেও গোঁসাই বংশ। হারান পাল গোঁসাই বংশের একজন অতি পরিচিত শিষ্য। তার মেয়ে সুহাসিনীকে এক কথায় ফেলে দেওয়া যায় না। গোঁসাই মাও বললেন, আর কোথায় যাবে! বড় খোকা বাড়ি নেই। কলকাতায় থাকে। কলেজে পড়ে। ঘর যখন খালি আছে— আপনে এই ঘরটায় থাকলে আমাদের কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা না।

সেই থেকে ওদুদ কাকা তার বাবার পঞ্চানন তলায় কলোনির বাড়িতেই

দেড় দু-বছর থেকে গেছিলেন।

কত কথা যে মনে হয়!

আত্মগ্লানির পীড়া থেকে সে খানিকটা যেন রেহাই পেয়ে গেল।

সুহাসিনীর কথা ভাবলেই মন অশান্ত হয়ে ওঠে। সে আর এক গ্লানি। সারাজীবনই এই পীড়ন তাকে সহ্য করতে হবে।

তবে বাসের মেয়েটির পীড়ন থেকে এই সুহাসিনীর পীড়ন সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ সে কত বুঝিয়েছে, সুহাসিনী রাতে তুমি এস না।

কেন ঠাকুর, তোমার কাছে গেলে অপরাধ কেন হবে।

হয়। অপরাধ হয়। আমরা ধরা পড়ে গেলে আমার বংশের মাথা কাটা যাবে।

যাক না।

কী বলছ?

ঠিকই বলছি। আমি যে তোমাকে দেখলেই বড় চঞ্চল হয়ে পড়ি। আমি কি করব বল?

কিছু হয়ে গেলে!

হোক না!

কী বলছ!

ঠিকই বলছি। আমার তো কেউ নাই ঠাকুর। তুমি আমার সমবয়সী, তুমিই বুঝবে এটা আমার পক্ষে কত বড় মরণ। এই মরণেও যে সুখ আছে। আমি যে অবলম্বন খুঁজে বেড়াচ্ছি। মা বাবা আত্মীয় স্বজন কেউ আমাকে গ্রহণ করতে চায় না। সেই নলহাটির দিকে কোথায় খোঁজ পাওয়া গেল বাবা-মা ভাই-বোন এবং আত্মীয় স্বজন, কেউ বাদ গেল না। শুধু তাঁরা বলেছে, সুহাসিনী আমাদের কেউ নয়। সুহাসিনী নামে আমাদের বংশের কেউ নেই। ওদুদ মিঞাতো ছাড়ার পাত্র নন। তিনি যে বললেন, আমি সর্বসমক্ষে হাজির করছি তাকে। আপনারা দেখুন।

তখনই সুহাসিনীর বাবা কাকারা সবাই তেড়ে গেছিল, উদ্বেগের ভূত, মিঞা আপনাদের জন্য একবার দ্যাশ ছাড়া হইছি। আবার দ্যাশ ছাড়া কইরেন না। বংশের মাইয়া মুসলমানের ঘরে ঢুইকা গ্যালে আমাদের যে জাত যায় মিঞা।

তিনি তো তারপর মাথা নীচু করে ফিরে এলেন।

একটা কথাও বলতে পারলেন না।

তিনি তো ফিরে এসে সব মেজোগোঁসাইকে বললেন, কারও দোষ নেই

ক্ষীরোদ ভাই। সব মাইয়াখানের কপালের দোষ।

সেই সুহাসিনীকে নিয়ে ঝড়বৃষ্টির রাতে তিনি এসে উঠেছিলেন কলোনির বাড়িতে। আবার বছর দেড়েক বাদে রাতেই সুহাসিনীকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। কোথায় যে গেলেন! যদি দেশে চলে যান যেতেই পারেন, তবে সুহাসিনীর কপালে কি যে লেখা থাকবে কে জানে।

মুশকিল সুহাসিনী একা নয়। পেটে তার গোঁসাই বংশের জাতক ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। হিসাব করলে সে এও বুঝতে পারে গোঁসাই বংশের জাতক এই দেশের কোথাও জল হাওয়ায় বড় হচ্ছে। সুহাসিনী যে একা নয়। সে তার সন্তানকে নিয়ে ওপাড়ে কখনই ফিরে যেতে পারে না। আর ওদুদু কাকা স্নেহের এমন ফাঁসে জড়িয়ে গেছেন যে তাকে ছেড়েও যেতে পারবেন না।

সাত

সে কলকাতা থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে, বাবার প্রশ্ন, তোকে কিছু বলেছে!

কী বলবে?

না বলতেও পারে। কেউ জানে না, কোথায় চলে গেল!

তার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, জেনে কি হবে? তাকে কি ফিরিয়ে আনতে পারবেন, সে তো গোঁসাই বংশের কুলটা, সে তো কলঙ্কিনী— আপনার বংশের মুখের কালি ভেসে উঠলে, আপনি কোথায় যাবেন! সে তো আপনার পুত্রের কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বের হয়ে গেছে।

এইসব কথা মনে পড়লেই সে কেমন চুপ হয়ে যায়। এক আশ্চর্য স্নিগ্ধ মুখ, চোখে অশ্রু, তার ভিতরে সন্তান আগমনে তার মুগ্ধতা যে অপরিসীম, চিঠির ছত্রে ছত্রে তা ফুটে উঠেছিল।

এবং সে অর্থাৎ মিহির যখনই অপরাধ বোধে ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন সম্বল সেই নারীর অস্তিত্ব বড় এক পবিত্র আধার— যেন সেই তাকে অর্থাৎ মিহিরকে চিরকাল সব রকমের সঙ্কট থেকে রক্ষা করে যাবে।

নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য যেন সে চির নিবেদিত প্রাণ— আর কত আয়াসে বাসের মেয়েটি তাকে বলতে পারল— বাড়িতে কি আপনার মা বোন নেই?

বাবু, লিফট ওপরে যাবে না।

মিহিরের হুস ফিরে এল।

সে কখন অফিসে ঢুকল, কখন থেকে লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জানে না।

তারই অফিসের বেয়ারা গণপতি কি তাকে বেকুফ ভেবে ফেলল! ফেলতেই পারে।

তারা তো জানে না, বাসে সে কী ঝাড় খেয়েছে— মেয়েটা তার দিকে একবারই তাকিয়েছিল, ঘৃণায় চোখ মুখ কি যে বিকৃত দেখাচ্ছিল।

সে বলল, লিফট যাবে না!

না, সার।

তার বলার ইচ্ছে হল, তোমাদের কোম্পানির এই এক দোষ গণপতি— লিফট কেবলই খারাপ হয়। এক লিফট মেরামতেই কোম্পানির সব লাভ উবে যাবে।

বোনাসের কিছু খবর পেলে!

আজ্ঞে শেষ পর্যন্ত সেই সাড়ে আট।

এই কোম্পানির হবু মালিক একজন ওড়িশি মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করায় মিহিরের ধারণা অন্দর মহলের খবর গণপতিরাই বেশি রাখে। আর তারপর সে সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

গণপতি ডেসকেই কাজ করে। সে চলে গেলে মিহির একা। এক গাদা কাজ একা সামলাতে হবে। টেলিপ্রিন্টার দুটো খট খট করে চলছেই। গণপতি থাকলে সুবিধা। সে টেলিপ্রিন্টারের সব খবর গোছগাছ করে রেখে দেয়। বড় খবর থাকলে বলেও দেয়।

বর্ষাকালে দুটো খবর বেশি থাকে।

কোথায় বন্যা হচ্ছে— কোথায় ঝড় বৃষ্টিতে বাড়িঘর ভেঙে পড়ছে, গঙ্গা ফি বছর এই বর্ষায় রাশি রাশি জমি গিলে খায়— তবে খবর পুরনো হয়ে গেলে, সাধারণ খবরের মতই তাকে কাগজের পেছনের পাতায় গুঁজে দিতে হয়, গণপতির উপর নির্ভর করা যায়, সে সবসময় যেমন বাবুদের ফুট ফরমাস খাটে, বান্ডিল বান্ডিল কাগজ কেটে তার টেবিলে রেখে দেয়, তবে অপ্রয়োজনীয় খবরের ক্রিড সে নিজেই ঝুড়িতে ফেলে দেয়—

আসলে গণপতি খবর বোঝে।

তিনতলায় তার অফিস।

একতলায় ছাপাখানা।

দোতলায় কাগজের লাটের হিসাব, প্রুফ রিডারদের বসার জায়গা এবং কাঠের পার্টিসান দেওয়া গালিচা পাতা ঘরে সম্পাদকেরা বসেন। সহকারী সম্পাদকের ঘরই বলা ভাল। ঘরের পাশে দরজার সামনে টুলে বসে মনোহর

পান চিবুচ্ছে।

এখন হাজারিদার শিফট। তার আসতে দেরি হয়। তিনি একজন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা। দুটো স্কুলের সেক্রেটারি, তারপর স্থানীয় ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। তাঁর গণসংযোগ একটু বেশি মাত্রাতেই আছে। ক্ষমতায় কংগ্রেস, সুতরাং হাজারিদাকে সবাই কম বেশি সমীহ করে।

সে অর্থাৎ মিহির হাজারিদার খুবই আস্থাভাজন।

তিনি জানেন, দেরি করে এলেও তাঁর শিফট মিহির ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবে।

বিকেলের এই শিফটে টেলিপ্রিন্টারগুলি অনবরত খবর ওগলাতে থাকে।

সে হাজারিদা না আসা পর্যন্ত তার চেয়ারে বসেই সব কাজকর্ম সামলায়।

সে চেয়ারে বসে প্রথমে একটা হাই তুলল।

তারপর এক গ্লাস জল চাইল গণপতির কাছে।

আর বসতে না বসতেই তিনটি ফোন।

অতুল্য ঘোষ মশাই কি ইন্দিরার বিরুদ্ধাচরণ করবেন?

সে বলল, আমি জানব কী করে!

আপনাদের দিল্লির সাংবাদিক তো বড় বড় চোতা খবর পাঠান— তিনি দিল্লির খবর রাখেন না! তিনি তো রাজনীতির হেঁসেলের খবর পর্যন্ত রাখেন।

মিহির বলল, আপনি জানেন কি আমার অফিস থেকে ট্রামে অতুল্যবাবুর বাড়ি পাঁচ মিনিটের রাস্তা। আপনার যখন এত গরজ, পেটের ভাত হজম হচ্ছে না— আমি জেনে আসি। ফোন ধরুন। বলে নির্বিকার চিত্তে ফোনটা কেটে দিল। এরা খবরের কাগজকে কি ভাবে! একজন কাটোয়ার দুর্ঘটনায় মৃত মানুষদের তালিকায় সুধন্য শর্মা বলে কোনও নাম আছে কিনা জানতে চাইল।

এই গণপতি ফোন ধর। তালিকাটা পড়ে শুনিয়ে দাও।

তারপরের ফোনে ধর্ষণের খবর।

এ-ভাবেই অফিসে তার কাজকর্ম শুরু হয়। যতক্ষণ হাজারিদা এসে তাঁর কাজের দায়িত্ব না বুঝে নিচ্ছেন— ততক্ষণে তাকে টেলিপ্রিন্টারের খবরের ওপর চোখ রাখতে হয়, সে-জন্য মাঝে মাঝে টেলিপ্রিন্টারের ওপর ঝুঁকেও দেখতে হয়।

এখন বন্যার খবর আসছে। বর্ষা এলেই সব নদী খেপে যায়। ঘর বাড়ি ভাঙে, নদী মহাতেজি হয়ে ওঠে। গ্রাম মাঠ ফসলের ক্ষেত নদী গর্ভে গিলে

খায়। বড় বড় হেডিং-এ খবরগুলো আসে। এত খবর যে শুধু বন্যার খবর ছাপলেই গোটা কাগজ ভরে যাবে।

সেই টেলিপ্রিন্টারে একটা লম্বা কাগজ গণপতিকে ধরিয়ে দিলে গণপতি জানে তাকে কি করতে হবে। ফ্যাশ ফ্যাশ করে কাগজ লিড অনুযায়ী সাজিয়ে তার টেবিলে রেখে আসার কথা।

কিন্তু ফোন কেটে দিয়ে তো সে আবার পীড়নে পড়ে গেল। ফোন কেটে দিয়ে সে তার কাজের নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কোনও বড় খবর যাতে মিস না হয়, খুবই সতর্ক নজর যখন খবর বাছাই করছিল, তখন ফের কুট কামড়। মিহির এটা কি করলো! মনে রাখবে যারা ফোন করেন, তারা সবসময়ই তোমার কাগজের পাঠক— তোমার এই দুর্ব্যবহারে কাগজের সুনাম নষ্ট হয় বোঝো!

সত্যি তো।

সে কেমন কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে গেল। কেউ শুনতে পেলে, সেটা যে নিউজ এডিটরের কানে উঠবে না কে বলতে পারে। তবে চারপাশে কিংবা কাছাকাছি কি কেউ ছিল! সিফটের সব সাব-এডিটররাই যাঁর যাঁর টেবিলে বসে আছেন। এদেরকে দিয়ে মোটামুটি কিছু খবর করিয়ে রাখতেই হয়। কাগজে ছাপা হোক না হোক, করিয়ে রাখলে, বিজ্ঞাপন কম এলে কাজে লেগে যায়। তা-ছাড়া সে এসে যে বিন্দুমাত্র বসে থাকেনি তারও প্রমাণ। কিন্তু তাই বলে তো সে কিছুতেই বলতে পারে না, দেখি জিজ্ঞেস করে আসি। ধরুন। কিন্তু সে ফোনই কেটে দিয়েছে— কার ওপর তার এই ক্ষোভ। সে কি এখনও মেয়েটির ভর্ৎসনা ভুলতে পারেনি। চড়িয়ে সব কটি দাঁত ফেলে দেব। বাড়িতে মা বোন নেই! তারপর চড়িয়ে দাঁত খুলে দিলে, একজন সহ- সম্পাদকের কত বড় অপমান— তারপরই বাসে সে এখন মেয়েটির দূরত্ব পরিমাপের চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল মেয়েটিরই দোষ। পিঠ কোমর এত উঁচু করে রাখা উচিত হয়নি।

আমার যেমন দায় আছে, তোমারও আছে।

রড ধরে নুয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে গেলে, তোমার শরীরের পেছনে যে পাঁচ ইঞ্চির মত জায়গা দখল হয়ে যায়। ভিড়ের বাসে এতটা তোমার সাহস হয় কি করে! আমাদের হাত লাগলে তোমাদের ইজ্জত নষ্ট। আমাদের কোনও ইজ্জত নেই বুঝি। ঠেলাঠেলি করে উঠতে গেলে তা লাগতেই পারে। তার জন্য এমনভাবে ফোঁস করে উঠলে! তুমি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হয়ে আছ!

এইসব আত্মগ্লানি থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছে না সে।

সব কাজে এখন ভণ্ডুল।

তখনই গণপতি এক গুচ্ছ খবর তার সামনে রেখে বলল, সুহাসবাবু কপি চাইছে।

এত গরজ!

সে জানি না। হাজারিবাবুকে বলে রেখেছে, তিনি খবর কভার করার জন্য তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবেন।

খবরতো নয়, আসলে সুহাস প্রেম করতে যাচ্ছে। ট্যাক্সিতে তুলে, এই নগরীর আলো অন্ধকারে, অথবা গ্লোবে কোন ইংরাজি বই-এ নায়িকার উদোম গা দেখার জন্য খবরের নামে বের হয়ে পড়া।

মিহির বলল, খবর নেই।

খবর নেই কেন স্যার। রেপ বলে হেডিং হয়ে একটা খবর আসছে। দেখুন না, যদি বলেন ওটা দিয়ে আসি। ওটা করিয়ে রাখুন না। মিহির উত্তর না দেওয়ায় সে ফের বলল, রেপের খবর না থাকলে কাগজ লাটে ওঠে জানেন।

গণপতি!

ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর মিহিরের।

তুমি চার্জে আছ, না আমি আছি।

আপনি সার।

তা হলে তোমার কথা মতো আমি কাজ করব কেন ভাবছ। কোনও রেপের খবর যাবে না।

এত বড় লিড হয়ে আসছে খবরটা।

যত বড় লিডই থাকুক। রেপের খবর যাবেনা। মাথা তার যে তপ্ত হয়ে আছে, সে বুঝতে পারছে।

ততক্ষণে সুহাসও তার টেবিল থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, আপনার কি শরীর খারাপ মিহিরদা।

কোনও কপি না করে অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে মিহিরদা।

ডিউটি বলে কথা।

মেয়েটার কথা মনে পড়লেই তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। সব সতীসাধ্বি!

কী হল মিহিরদা।

কি হবে আবার!

না, বলছি চুপচাপ বসে আছেন।

আমার খুশি বসে আছি।

আপনি রাগ করছেন মিহিরদা। চোখ মুখ কেমন দেখাচ্ছে। আপনার শরীর ঠিক আছে তো?

তোমার কপি করার এত গরজ যখন, রেপের খবর বাদ দিয়ে আর যা আছে তার থেকে তুলে নাও।

রেপের খবরটা নিলে কি হবে?

রেপের খবরটা করার তোমার এত আগ্রহ কেন বলত!

না বলছিলাম। অন্য কোনও খবর কপি করার মত নয়।

এই গণপতি, টেলিপ্রিন্টারের কাগজ কিন্তু লম্বা হয়ে আছে। দ্যাখো কি আছে।

গণপতি কাগজ তুলে কি দেখল, তারপর কাগজটা ছিঁড়ে ঝুড়িতে ফেলে দিল।

কিছু নেই।

আজ্ঞে রিপিট খবর। আপনি তো বললেন, রেপের খবর যাবে না।

সুহাস বুঝতে পারছে, আসলে দাদা তাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। সে নিজেও পছন্দ করে যে কপি নেবে তারও উপায় নেই।

সুহাস না বলে পারল না, আজকে আপনার কী হয়েছে বলুন তো।

কী হবে।

মুখ গোমড়া করে রেখেছেন।

বিয়ে থা করেন নি, একা মানুষ—

একা মানুষের বুঝি কোনও দুঃখ বিষাদ কিংবা আত্মগ্লানি থাকতে পারে না। আসলে কি জান ধর্ষণ বিষয়টাই বড় গোলমেলে। কোনও নারীকে একা একজন পুরুষ কব্জা করতে পারে না। নিজেরা হট হয়ে থাকে, মেয়েদের শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠলে উম্মাদ হয়ে যায় জানো। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তারপর শরীর ঠাণ্ডা হলে যদি কিছু হয়ে যায়, এই আতঙ্কে ধর্ষণ বলে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। গণধর্ষণ হলে অবশ্য আলাদা কথা।

এটা আপনার ভুল ধারণা মিহিরদা। আমাদের দেশের মেয়েরা উঠতে বসতে ধর্ষিতা হয় জানেন।

হয় কিনা জানি না, কারণ তা কখনও প্রমাণ করা যায় না। মেয়েটি সাগ্রহে পুরুষটির ক্রিয়াকলাপ যে সহ্য করেনি, তারও কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়।

সুহাস বলল, দেশের বর্তমান আইন কানুন ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্তকে সেভাবে ফাঁসাতে পারে না। আমাদের সমাজে ধর্ষিতা মেয়েরা ব্রাত্য, তাই আতঙ্কে, অধিকাংশ মেয়ের বাবা মা-রা আদালত এভয়েড করে। আইন আরও কঠোর হওয়া উচিত।

ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না, বেচারার কপালে দুর্ভোগ আছে। তা হলে ধর্ষণের খবরটি করে দিয়ে যাও। বেশি বড় করবে না। টপ করবে। সুহাস খুশি হয়ে চলে যাচ্ছিল, মিহির তাকে আবার ডাকলেন—

শোনো।

কিছু বলবেন?

আমাদের সমাজে অবিবাহিতা মেয়ের চেয়ে বিবাহিতা মেয়ে বেশি ধর্ষিতা হয় বোঝো।

সে আবার কেমন কথা। সুহাস হতবাক হয়ে গেল।

আমি নিজে জানি, পূর্ববঙ্গে আমাদের বাড়ির পাশে যতীন করের বাড়ি। দুই ভাই। নরেশ কর, যতীন কর। ছোট ভাইটিকে পরমাসুন্দরী একটি বালিকার সঙ্গে বিয়ে দেন। যতীন কর, কালো বেঁটে। আমাদের দেশে জানো সবই প্রায় টিন কাঠের ঘর, মুলিবাঁশের বেড়া— ঘরের পাশেই আমাদের বাড়ির সীমানা— তারপরই যতীন করের মুলিবাঁশের বেড়া দেওয়া ঘর।

রাতে বউটি কান্নাকাটি শুরু করলেই মা বলতেন, আরম্ভ হয়ে গেল। আরে সময় দিবি না। তখন বুঝতাম না, 'সময় দিবিনার' সঠিক কি অর্থ। বছর খানেক পরে মেয়েটির কান্না থেমে গেল ঠিক, তবে সকালে উঠেই বাসি কাপড় বুকে জড়িয়ে আমাদের উঠোন পার হয়ে পুকুর ঘাটে চলে যেত। আর কেবল থুথু ছিটাতো। আমাকে বউটি সঙ্গে নিত। আমার একটাই কাজ, বউটি ডুব দিলে বলা, তার চুল ভেসে নেই। তার শরীর প্রকৃতই জলে ডুবে গেছে। চুল, শাড়ির আঁচল কিছুই ভেসে নেই। একটু লক্ষ্য করলেই টের পেতাম জলের নীচে সে নগ্ন হয়ে আছে। আর নানারকম ঘসামাজা চলছে। কেমন শুচিবাইগ্রস্থ। খুবই ছেলেমানুষ আমি তখন। যৌনতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। আসলে কি জান, আমাদের সমাজে কোনও যৌনশিক্ষাই নেই। নারী যৌনতায় অশান্ত হয়ে উঠলে কী যে হয়!

এটা কি আপনার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ।

মিহির এই প্রশ্নে বেকুফ। সবাই জানে সে একা মানুষ— বাসায় একজন চব্বিশ ঘন্টার লোক আছে। ছুটি ছাটায় দেশের বাড়ি চলে যায়। যৌনিদেশ

সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতাই থাকার কথা নয়। সেই মানুষের মুখে রতিক্রিয়ার কথা শুনে, দাদা যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে ভাবতেই পারে। বাসের মেয়েটিই হয়েছে কাল। এই মেয়ে যে সামান্য স্পর্শে তার মা-বোন তুলে গালাগাল দিল, দেখেতো মনে হচ্ছে খুবই ভদ্রঘরের মেয়ে এবং সালোয়ার কামিজ পরে থাকায় পুরুষের হাত লাগলে ক্ষিপ্ত হতেই পারে। অথবা বাসে যাওয়া আসার অভ্যাস বোধহয় কম। ভিড়ের বাসে পুরুষরা সুযোগ খুঁজেই থাকে, কোনও তর্কে না গিয়ে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল ছিল মেয়েটির।

যারা রোজকার বাসে যাওয়া আসা করে তারা এটা ভালই বোঝে। তারা বাসে গোলমাল করে তামাসার পাত্র হতে চায় না। আবার ভালও লাগতে পারে, শত হলেও পুরুষ মানুষ, পুরুষ মানুষের হাত, শেষ পর্যন্ত এই পুরুষমানুষই তো চেটে পুটে খায়।

তখনই দেখল সুহাস আবার টেবিল থেকে উঠে আসছে।

মিহিরদা।

বল।

এটা কিন্তু প্রথম পাতার খবর।

তা হউক।

ডাবল কলামে করি।

মিহির জানে অবিবাহিত যুবকের পক্ষে এই সব খবর খুবই রোমহর্ষক। খবরটি পড়তে পড়তে সে হয়ত যৌনতার শিহরণ বোধ করছে। সে বেশ খেলিয়ে খবরটা করতে চায়।

দেশের সেই বউটির কথা তার মনে হল—

মা ডাকছে, ওরে মিহির ওঠ। বৌমার সঙ্গে যা। সে তো আর কাউকে বিশ্বাস করে না। মিহির বললেই বিশ্বাস করে— জলে ডুব দিয়ে সে পবিত্র হয়েছে। বড় হয়ে বুঝেছে মিহির যৌনক্রিয়ার অতৃপ্তি থেকেই এই শুচিবাই। তুই সঙ্গে যা। আর কাউকে বিশ্বাস করে না বৌমা।

হয়েছে?

না হয়নি। চুল ভেসে ছিল।

আবার ডুব।

হয়েছে?

না হয়নি। শাড়ির আঁচল ভেসে ছিল।

এই হয়নি যতবার, ততবার ডুব।

বউটির ডুবে ডুবে চোখ লাল। তবু সে পবিত্র হতে পারছে না।

নারী যে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে উন্মাদ হয়ে যায়! তার অতৃপ্তি থেকে গেলে সে পাশ ফিরে শোয় এবং নিজের যোনিদেশ নিজেই চটকায়। সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি তার ঘৃণা— তোমরা সব কাপুরুষ।

আসলে সে কিছুতেই বাসের ঘটনা ভুলতে পারছে না। সেই বউটি ফেরার সময় সারা রাস্তায় জল ছিটাত— উপগত হবার সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনক্রিয়া হলে নারীর ঘৃণা জন্মাতেই পারে।

বাসের একটি লোক প্রতিবাদ করল না!

পরিচিত কেউ পাশে থাকলে ঠিক প্রতিবাদ করত।

আপনি মুখ সামলে কথা বলুন। কাকে কি বলছেন। আসলে মিহির কেন যে নারীজাতির উপর খেপে যাচ্ছে। সব স্বার্থপর।

সন্তানবতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই যেন সুহাসিনী তাদের বাড়িতে পড়েছিল। তার অবলম্বন নেই, তার অবলম্বন দরকার।

সে যে ওদুদু কাকার সঙ্গে পালাল, সেও তার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য।

ধরা পড়লে গোঁসাই বংশের এই কেলেঙ্কারী সমাজ মেনে নিত না। অনাচার থেকে বংশকে উদ্ধার করার জন্য গর্ভমোচনের চেষ্টাও হত। সুহাসিনী এই সব আতঙ্কেই যে ওদুদ কাকার সঙ্গে পালিয়েছে, মিহির তা বিলক্ষণ বোঝে।

এমন কি আজকাল সুহাসিনীর প্রেম সম্পর্কেও সংশয় তৈরি হয়েছে। তপ্ত শরীর সুহাসিনীকে তাড়া করেছে। সমবয়সী দু'জন নর-নারী কাছাকাছি থাকলে যা হয়।

তার মাথার ওপর পরিবারের কোনও অভিভাবক নেই। গোঁসাইবাবাই একমাত্র অভিভাবক, যিনি তাকে স্নেহ করেন। সংসারে সে লেপ্টে ছিল। গোঁসাই বাড়ি উঠে আসার পর থেকে এবং মিহিরকে দেখার পর থেকেই সে তাদের কলোনির বাড়িটিকেই নিজের বাড়ি মনে করেছিল। বাড়ির সবার, মা জেঠি কাকিদের, ভাইবোনদের সে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার মার্জিত রুচি সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল।

গোঁসাইবাবার কাছে সুহাসিনী প্রতিমাস্বরূপ। মায়ের কাছে লক্ষ্মী স্বরূপা। সেই মেয়ে যে ভেতরে ভেতরে কালনাগিনী গোঁসাইবাড়ির কেউ তিলমাত্র টের পায়নি। সুহাসিনী তার গুরুবংশকে অতিশয় এক বিপাকের মধ্যে ফেলে দেবার চক্রান্ত করেছিল। আসলে চক্রান্ত না এটাই তার বাসনা— কারণ তারতো সম্পর্কহীন হয়ে বাঁচা কঠিন— সামনে দুরন্ত পারাবার। ওদুদ কাকাতো

তার অবলম্বন হতে পারে না। সে হিন্দুর মেয়ে, তার নিজের পরিচয়ের দরকার। সে জননী। কেউ তাকে মা বলে সম্বোধন করলে জগত সংসার যে অসীম অপার ভালবাসায় সে নিযুক্ত হয়। মা— এই শব্দ উচ্চারণেই সে মুগ্ধ। সে নারী, সে জননী।

আসলে মিহির সুহাসিনী নিখোঁজ হয়ে যাবার পর থেকে এ-ভাবেই চিরে চিরে সুহাসিনীকে বিচার করেছে।

সে নারী, সে জননী।

আজ বাসে আবার জননীর অন্যরূপ দেখে— সে যে দেখেছে ঠিক ঠিক তাও অবশ্য বলতে পারবে না। কোনও নারী প্রশস্ত শরীর বিস্তার করে রড ধরে উবু হয়ে যদি বাইরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করে, তবে যেমন হয়, মুখের কিছুটা অংশ দেখা যায়, কিছু কল্পনায় ধরা যায় এবং ফের বাসে উঠলে ভিড়ের মধ্যে নারীমুখ একই প্রকারে তাকে বিড়ম্বনায় ফেলে দিতে পারে। বিকেলের সিফটই কাগজের জরুরী সিফট। জরুরী শিফটে সবাই এসে গেছে, নিউজ এডিটর তাঁর ঘরে— হাজারিদাও এসে গেছেন। তিনি এলে মিহির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল— কি কি খবর সে অনুবাদ করিয়েছে— কার কার কাছে কি কপি আছে, তার একটি রেজিস্ট্রি খাতা এগিয়ে দেবার আগেই হাজারিদা বললেন, রাখ দেখছি। এই গণপতি, এক গ্লাস জল দে।

গলায় প্যাঁচানো একটি চাদর জড়ানো থাকে হাজারিদার। শীত গ্রীষ্ম এই চাদরটি হয় গলায় পেঁচিয়ে রাখেন, নয়তো কাঁধে ফেলে রাখেন। অফিসে ঢুকে চেয়ারে বসার আগে চাদরটি তার বসার চেয়ারে পাট করে রাখেন, তারপর জল খান, তারপর খাতাটি খুলে দেখেন। কোঁচানো ধুতি সিলকের পাঞ্জাবি পরেন, পায়ে পাম-সু। মিহির হাজারিদাকে যথেষ্ট সমীহ করে, রেজিস্ট্রি খাতাটি না দেখা পর্যন্ত সে নড়বে না।

আরে তুমি এটা কী করেছ! আসল খবরই দেখছি না। আজকে দিল্লিতে সিন্ডিকেটের মিটিং, তারতো ক্লিপিং কিছু দেখছি না। দিল্লি অফিস কিছু পাঠায় নি?

আরে যাঃ।

আরে যার কি হল! প্রথম পাতায় ওটাইতো কাল মেন খবর। অতুল্যবাবু, কামরাজ, মোরারজি দেশাই— কোনও কপি পাওনি।

পেয়েছি।

কোথায়?

বাসকেটে গুঁজে রেখেছি।

তুমি কি পাগল হয়ে গেছ। আমার চাকরিটা খাবে দেখছি। তুমি যিশুবাবুর পেয়ারের লোক, লেখক মানুষ, তোমার শত দোষ মাপ হয়ে যাবে। আমরা ছাপোষা মানুষ ভাই, গণপতি, খবরের ঝুড়িটা নিয়ে আয়তো।

আমি আনছি দাদা।

মিহির নিজেই ছুটে গিয়ে টেলিপ্রিন্টারের পাশ থেকে ঝুড়িটা তুলে আনল। কিন্তু কিছু পেল না।

মিহির কী যেন ভাবছে।

কোথায় ফেললে।

ফেলিনি।

তা হলে কোথায় গেল!

বুঝতে পারছে মাথার মধ্যে বাসের সেই মেয়েটির গায়ে হাত লাগার পর সব আড়াল করে রেখেছে। মাথা থেকে কিছুতেই সেই দৃশ্যটি পরিবর্তন হচ্ছে না। ক্ষোভে সে ভিতরে জ্বলছে। তার গোলমেলে কারণের জন্য মেয়েটির কুৎসিত তিরস্কারই দায়ি, সেই থেকে তার কারণে কি কোনও পাগলামি দেখা দিয়েছিল।

দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? না থাকে তো প্রদ্যোতের কাছে চেয়ে নাও।

সেই কিছুটা দূরে দৈনিক ইংরাজি কাগজের চিফ এডিটর প্রদ্যোতের কাছে ছুটে গেল মিহির।

মিহিরবাবু যে! আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। কথা দিয়েছি আপনাকে যে করেই হোক ধরে নিয়ে যাব।

প্রদ্যোতবাবু, সিন্ডিকেটের কোনও খবর আছে।

এখনও কিছু আসেনি। বড় খবরের বড় ব্যাপার। আস্তে আস্তে ছাড়ে।

প্রদ্যোতের ইয়ারকি মারার স্বভাব আছে। এমনি খুবই ভালমানুষ। সজ্জন। রসিক। অসভ্য কথাবার্তা সে সহজেই বলতে পারে, এবং শুনতে ভালোও লাগে।

আসেইনি বলেছেন।

একেবারে আসেনি বলব না, তবে দিল্লি অফিসের কপি না আসা পর্যন্ত কিছুই আসেনি ভেবে নেওয়া যেতে পারে।

প্রদ্যোতের স্বভাবই মজা করার— নারীরা হচ্ছে পুরুষ মানুষের ফুয়েল। তারপরে সুন্দরী নারী হলে তো কথাই নেই। বুঝতেই পারছেন, এই যে

সিন্ডিকেটের সদস্যরা— সবারইতো ফুয়েল ছিলেন তিনি। তাদের তিনি এখন একঘরে করে দিচ্ছেন— সব নতুন মুখ আমদানি হবে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ধরেই নিতে পারেন, বুড়ো হাবড়াগুলো হারছে।

মিহির না বলে পারল না, তাহলে তো কংগ্রেস ভেঙে যাবে। এতদিন যারা দলে ছড়ি ঘুরিয়ে আসছেন, তাঁরা কি সহজে ছাড়বে।

আরে মিহির আপনি কোন জগতে বাস করছেন বুঝি না। পরিবর্তন— যা দেবী সর্বভূতেষু, নারী রূপেণ সংস্থিতা, এখন থেকেই ধরে নিতে পারেন নারী যুগ শুরু হয়ে গেল।

বৈঠকতো শেষ হয়নি।

তা হয়নি, হবে। ভোটে বুড়োগুলো হারবে। দেখবেন। নারীর কী তেজ— তিনিই তাঁর মধ্যে প্রকাশ— ভারতবর্ষের ইতিহাসে আবার নারীর উত্থান হচ্ছে— তিনিই আমাদের প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে দিলাম। দেখবেন যুগের পর যুগ এই নারীরাই দেশ শাসন করবে।

মিহির বুঝল দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

তাহলে সত্যি বলছেন, কোনও খবর আসেনি? হাজারিদা আমার ওপর খুব তেতে আছেন।

যতই তেতে থাকুক দাঁড়াবে না। এই বুড়ো হাবড়াগুলিকে না তাড়ালে কাগজেরও উন্নতি হবে না।

বৃথা অপক্ষো করার অর্থ হয় না— মিহির হাজারিদার টেবিলে এসে বলল, এখনও তেমন কোনও কপি আসেনি। ওরা দিল্লি অফিসের জন্য অপেক্ষা করছে।

তারপরই হঠাৎ কেন যে রেজিস্ট্রি খাতাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হাজারিদা বললেন, এই কপিগুলো যে দিলে, কেন দিলে। এগুলো কখনও যায়! যত বাজে খবর, বলে তিনি সবটা ঢেঁড়া দিয়ে বললেন, এই গণপতি বাবুদের কাছ থেকে কপিগুলো তুলে নিয়ে আয়, আর এগুলো করতে দে। সেই বাস থেকে শুরু করে এখনও চলছে। সে কিছু না বলে খাতাটা নিজের টেবিলে নিয়ে এল।

মিহির খাতাটি মেলে তার খবর নির্বাচনের বিষয়টি কতটা সঠিক, না হলে হাজারিদা কেন এত বিরক্ত হবেন, সে দেখল প্রকৃতই তার নির্বাচিত খবরগুলি পড়তে কেউ আগ্রহ বোধ করবে না। খবর হিসাবে খুবই গুরুত্বহীন। হাজারিদা প্রবীণ মানুষ, কোন খবরের কি গুরত্ব এক দু লাইন পড়েই কাগজের পাতায়

যাবে কি যাবে না সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

মিহির টের পেল তার মাথাটা গেছে। মাথাটা বোধ হয় ধরেছে। অপমানের ধকল শেষ পর্যন্ত এতটা গড়ায় কখনও টের পায়নি সে। অভাবিত অসভ্যতার শিকার সে। আর ভাবতে গিয়ে কান্না পাচ্ছিল— এবং তার নিজের মধ্যে যে উৎকট চিন্তা ভাবনা চলছে তার থেকে রেহাই না পেলে রাতে ঘুমাতে পারবে না।

সুহাসিনীর মুখও ভেসে উঠল, তার চিঠির শেষ কটি লাইনের কথাও মনে হ'ল—

তুমি আমাকে আর খুঁজবে না।

আমি চলে যাচ্ছি।

তুমি আমার প্রিয়পুরুষ।

চলে যাচ্ছি ঠিক, তবে তেমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। জানি তুমি বাড়ি এসে আমাকে দেখতে না পেলে খুব ভেঙে পড়বে। তুমি শোকার্ত হয়ে উঠবে।

দোহাই ঈশ্বরের, তুমি আমাকে ভুলে যাও। আমি নিরুপায়, তোমার সঙ্গে উপগত না হলে আমার ঈশ্বরকে কোথায় পেতাম। যৌনতাই প্রাণ, প্রাণই ঈশ্বর, প্রাণের ঐশ্বর্য মৃত্যু— এই বোধের উৎস তুমি।

তুমি আমার গুরুবংশ। তোমার কাছ থেকে এই দীক্ষা নিয়ে যাচ্ছি।

আমার কাছে তিনি যে ঈশ্বর। আমার জরায়ুতে যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, একজন নারীর পক্ষে সেটা গৌরবের। এই জগত সংসারময় আমার বেঁচে থাকা আর অর্থহীন নয়। আমাকে আশীর্বাদ কর তোমার সৃষ্টিকে যেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে পারি।

তারপরই কেন যে মনে হল, সুহাসিনী ঠিক এ-ভাবে কিছু লেখেনি। তবে তার চিঠির তাৎপর্য আজ আবার কতদিন পর এ-ভাবেই ধরা দিয়েছে। সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অন্তত এই বিশ্বে একজন অন্তত বিশ্বাস করে, সে কখনও কোনও অভ্যবতা করতে পারে না। তবে নারীর জন্য সমুচিত শিক্ষার দরকার আছে। সে যদি সুযোগ পায় তবে সে এই সমুচিত শিক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

আট

এই এলাকায় মেলা ভেড়ি আছে। সকাল বেলায় মিহিরের সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দে ঘুম ভাঙে। ভেড়ি থেকে মাছ নিয়ে লোকজনের ছোটা শুরু হয়। তারপর কাগজ আসে। সে এককাপ চা খায় এবং কাগজটা উল্টে পাল্টে তার পছন্দমতো খবর পড়ে। ইদানিং তার বাসা থেকে সামান্য দূরে একটি বাসস্ট্যান্ডও তৈরি হয়ে গেছে। তবে তাকে এখনও সরকারি বাসের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হয়। বাড়িতে সে আর নন্দ। একতলা বাড়ি, কিছুটা আউটহাউজের মত, চারপাশে মেলা ফলের গাছ। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এরকম এক নিরিবিলি জায়গায় তার উঠে আসা কখনই সম্ভব হত না। সে সেই কবে থেকে একটা বাসা খুঁজছিল, কলকাতার ঘিঞ্জিগলির মধ্যে সে থাকতে রাজি না। হাজারিদাই বলেছিলেন, তুমি লেখক মানুষ— ইচ্ছে করলে আমার বাগুইআটির বাগানবাড়িতে থাকতে পার। পোস্টাপিস বাজার কাছেই। সেখানে থাকতে তোমার ভালই লাগবে। গাছপালা পাখ-পাকালি মেলা— শহর বাড়ছে। কিছুটা কাঁচা পথ, কিছুটা পাকা পথ পার হয়ে গেলে, ভি আই পি-তে বাস পেয়ে যাবে।

যীশুদাই হাজারিদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। যীশুদা কাগজের রবিবারের পাতাটি দেখেন, সে প্রুফ দেখে। মাঝে মাঝে তাকে দিয়ে ফাঁকা জায়গা ভরাটেরও চেষ্টা করতেন। তারপরই একটি মনোনীত গল্প কি কারণে বাতিল হয়ে যাওয়ায় বলেছিলেন, তোমার সুচারু গদ্যে গল্প লিখলে পার। গল্পটি আগামী রবিবারের পাতায় যাবে।

আসলে এর পরেই তার এই কাগজে চাকরি। হাজারিদাকে বলেছিলেন, খুবই গুণী ছেলে। মেসে থাকে, কেন যে হঠাৎ মেস ছেড়ে বাসা ভাড়ার চেষ্টা করছে ছেলেটা, বললাম, তুমিতো একা মানুষ। দেশ থেকে কারও আসার কথা আছে নাকি।

না। তেমন কিছু না, তবে কেউ যদি এসেই পড়ে, অর্থাৎ সুহাসিনী যদি প্রকৃতই জননী হয়ে যায়, সুহাসিনী যে-ভাবে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে, কিছু হয়ে গেলে তার কাছে নিয়ে আসা ছাড়া উপায় থাকবে না। তবে শেষ পর্যন্ত আর নিয়ে আসা হয়নি। সুহাসিনী নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তার বাড়ি ঠিক হয়ে যাওয়ায়, সে মেস ছেড়ে দিয়ে এই জ্যাংরার কাছে চলে এসেছে। এবং সুহাসিনীকে ভুলে থাকার জন্য সারাদিনই কাজে ব্যস্ত থাকে। তার ডিউটি

বিকেলের শিফটে, কখনও কখনও নাইট এডিটরের চার্জেও থাকতে হয়। মাস দু-মাসে মর্নিং শিফটেও তার ডিউটি পড়ে।

তবে যতই সে সুহাসিনীকে ভুলে থাকার চেষ্টা করুক, বিরহ যাতনা তার যাচ্ছে না। সে-জন্য সে একটা ঘোরের মধ্যে থাকে— চারপাশে সব কিছুর মধ্যেই সহাসিনীকে সে দেখতে পায়। সেই যে মেয়েটা তাকে বাসে অপমান করল, সে জানেই না তার একটা আলাদা পরিচয় আছে। রঙ্গন আর সে মেসে বছরখানেক ছিল। একটা ছোট গল্পের কাগজও বের করে তারা। তারা যে সাহিত্য পাগল মানুষ, এটা মেয়েটা জানেই না। এখানে বাসা নেবার পর রঙ্গন দু-একবার এসেছে। সংযুক্তার বিয়ের চিঠি সে পেয়েছিল, সংযুক্তা নীলিমা। দু'জনই মেসে এসেছিল, তার দেখা পায়নি। সেতো এক সময় সংযুক্তার জন্য কম পাগল ছিল না। সংযুক্তা তার প্রথম প্রেম। সংযুক্তা কলকাতায় না এলে তারও এখানে আসার কারণ ঘটত না। সুহাসিনী নিখোঁজ হয়ে যাবার পর যে পাগল পাগল অবস্থা, সংযুক্তা কলকাতায় চলে আসার পরও সেই পাগল পাগল অবস্থা। অথচ কলকাতায় এসে সংযুক্তার সঙ্গে দেখাই করতে পারেনি।

কলোনির বাড়ি থেকে তখন সে কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ে। ফার্স্ট-ইয়ারে ভর্তি হয়ে যাবার পরই কলোনিতে তার যথেষ্ট সুনাম হয়। কলোনির ছেলে, কলেজে পড়ায় কলোনির ইজ্জত বেড়েছে। জেলা কংগ্রেস অফিসে সে একটা কাজও পেয়েছিল। সেখানেই সংযুক্তার সঙ্গে আলাপ। কত কথা যে মনে পড়ে।

এরপর তার কাগজের অফিসেও ধাওয়া করে সংযুক্তা অর্থাৎ সনজু। সেদিন তার মর্নিং শিফট থাকায় দেখা হয়নি।

ওর স্বামীর সঙ্গে কিছু একটা গণ্ডগোল চলছে। মিহিরের হঠাৎ কেন যে মনে হল, সংযুক্তা স্বামী সহবাসে কি তৃপ্ত নয়। সংযুক্তা বনেদি বংশের মেয়ে। সে নিজও সঙ্গীত চর্চা করে। যখন সেতার নিয়ে সকালে সংগীতচর্চা করত তখনই কংগ্রেস অফিসের দোতলার জানালা থেকে সংযুক্তা অর্থাৎ সনজুকে দেখতে পায়— কলোনির ছেলে বলে সনজুর বাবা মা তাকে খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখত। তার সঙ্গে সনজুর মেলামেশা পছন্দ করত না— সনজু সংগীতে দু-বার রেডিওতে প্রোগ্রামও করেছে। সেই মেয়ের কলোনির ছেলের সঙ্গে মেলামেশা শোভা পায় না, কিন্তু সনজু নাছোড়বান্দা। সে মিশবেই। অগত্যা তার বাবা মা সনজুকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে— এবং বড় বড় ওস্তাদের কাছে তালিম নেবার ব্যবস্থা হয়। যাই হোক, এ-সব কথা তার মাথায় ঘুরপাক খেলেও সে সব ভুলে থাকতে চায়। দু-বার এই বয়সেই ধোঁকা খেয়ে মেয়েদের

কথা আর সে ভাবতেই চায় না।

কেউ তার গল্প পড়ে মুগ্ধ হলে চিঠিতে জানায়, আপনাকে ছুঁয়ে পবিত্র হতে চাই। এমনও কেউ লিখেছে। আবার কেউ সশরীরে উপস্থিত হয় তার কাগজের অফিসে।

তবু তার কেন যে মনে হয়, সুহাসিনী ফিরে আসতে পারে, সনজুও। কারণ তার ঠিকানা খোঁজার বিশেষ দরকার হয় না। কাগজের অফিসে ফোন করলেই জানতে পারে সে কোথায় আছে, এমন কি তার বাসার খবরও। যতই দুর্গম জায়গায় সে থাকুক পাঠক পাঠিকারা প্রিয় লেখকের খোঁজ, তারা নিতেই পারে।

নন্দ এসে খবর দিলে, যেমন তার খবরগুলো এ-রকমের, দু-জন লোক বসে আছে। তারা দাদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মিহির নিজের লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বলবে, কারা— তুই ওদের চিনিস!

আজ্ঞে না।

দু'জন লোক বলছিস, তারা দু'জনই কি ভদ্রলোক।

নন্দ অবাক হয়ে যায়।

ভদ্রলোকই তো বটে।

না বলছিলাম, কোনও ভদ্রমহিলা নয়তো।

আজ্ঞে না।

আসলে মিহির ভেবে থাকে, সুহাসিনী একদিন তার সন্তানকে নিয়ে যদি চলে আসে। পিতৃপরিচয় ছাড়া সন্তানের সমাজে স্থান পাওয়া কত কঠিন যতদিন যাবে তত এটা টের পাবে সুহাসিনী।

এটাই হচ্ছে কাল।

কে এল।

এক মহিলা।

মহিলা কেন? সঙ্গে তার কেউ আছে?

আজ্ঞে না। একাই।

তার কি রকম ঝড় উঠে যায়, ভাবে যদি সুহাসিনী হয়।

সনজু যদি হয়।

কতবার যে সনজু নীলিমাকে নিয়ে বিপিন পাল রোডের বাড়ি থেকে গোপনে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে সনজুর প্রোগ্রাম থাকলে আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গেছে। সে যায়নি। আসলে কোনও অজ্ঞাত অভিমান থেকে সনজুদের বাড়ির গেট পর্যন্ত হেঁটে গেছে। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে

সাহস পায়নি।

কলোনির পোলা। তুই মেশার ছেলে পেলি না সনজু?

কী হয়েছে মিশলে!

আরে ওরা কলোনিতে থাকে।

তাতে কী হয়েছে।

ওরা বাঙ্গাল।

বাঙ্গালরা কি ভাত খায় না।

তাই বলে আহাম্মক বাঙ্গালটাকে নদীর ধারে সাইকেল চড়া শেখাবি?

কি হয়েছে শেখালে!

কোন বাড়ির মেয়ে বুঝবি না। তোর বাবা ঠিকই বলেছে, একটা আহাম্মক বাঙ্গাল ছেলের জন্য আমাদের দেশছাড়া হতে হবে। কলকাতার বাড়িটা তোর বাবা খালি করে দিতে বলেছে উকিলবাবুকে। ওটা খালি করলেই আমরা কলকাতায় চলে যাব। তোর দাদু বেঁচে থাকলে কত কষ্ট পেত বল। কত বড় সঙ্গীতসাধকের নাতনি তুই। তোকে নিয়ে তার কত আশা ছিল।

আসলে সনজু ছিল মিহিরের কাছে বীনাপাণির মত। যেন প্রকৃতই সরস্বতী। সেতার হাতে তার সঙ্গীত চর্চায় ধ্যানমগ্ন ছবিটা চোখ বুজলে এখনও দেখতে পায়। বিয়ের পর একবছরও পার হয়নি বাপের বাড়ি বিপিন পাল রোডে সে চলে এসেছে। সে একবার কামিনী গোস্বামীর ওপর একটা কভারেজ করতে তাঁর কাছেও গিয়েছিল।

কামিনী গোস্বামীও তো বাঙ্গাল।

সনজুতো তাঁরও ছাত্রী। তারাপদ চক্রবর্তীরও ছাত্রী। কামিনী জ্যাঠাও তো বাঙ্গাল, বড় গাইয়ে না হলে কাগজ থেকে কখনও তাকে পাঠায়!

একটা প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে তাঁর লাইফ কভারেজ হচ্ছে। কামিনী জ্যাঠাতো একবার বহরমপুরে জেলা সঙ্গীত সম্মেলনে প্রধান বিচারক হয়ে গেছিলেন। তখন সে স্কুলে পড়ে। জ্যাঠা চা খাবে। সে-জন্যে বাড়িতে হুলস্থুল ব্যাপার। তারা তো চা খায় না। খেলেও কাঁসার গ্লাসে খায়। কাপ ডিসের ব্যবহারই নেই। তবুও বাবাকে বললেন, চলে এসে ভাল করেছিস ক্ষীরোদ। কতদিন পর দেখা। এখানে এসে মনে হল তোরা শহরের কাছাকাছি কোথাও থাকিস। চলে এলাম। কামিনী জ্যাঠার মেয়ে নীলিমা। সেই খবরটা দিয়েছিল।

মিহিরের মনে হয়েছিল সেও হেঁজিপেঁজি নয়, তাদেরও ঘরানা আছে। দেশের বাড়িতে কামিনী জ্যাঠা তাদের বাড়ি থেকেই স্কুলে পড়েছেন। সনজু

খবরটা পাবার পর তাকে আর বেকুব কিংবা আহাম্মক ভাবতে পারেনি। তার জন্য সনজুর মধ্যে এক প্রকারের সখ্য তৈরি হয়ে যায়। বাসা বাড়িটায় একা থাকলে তার যে কত কথা মনে হয়। বিকেলের শিফটে ডিউটি থাকলে ভিড়ের বাসে উঠতেই হয়। ভিড়ের বাস যতই পরিহার করতে চাক, শেষ পর্যন্ত কপালে তার ভিড়ের বাসই থাকে।

তবু সে চেষ্টা করে ভিড়ের বাস এড়িয়ে যেতে। সেই মেয়েটা ভিড়ের বাসে উঠলেই তাকে তাড়া করতে থাকে। ভিড়ের বাসে আবার যদি কেউ অকারণ অপমান করে!

অবশ্য কপাল।

সে ভিড়ের বাসে যতই সর্তক থাকুক, কপালে থাকলে তার চেয়েও বেশি দুর্গতি তাকে ভোগ করতে হতে পারে। দৈব মনে হয়।

সে কি দৈবের চেয়েও কিছু বেশি।

দৈব না হলে অফিস ছুটির পর তার আবার এমন একটা চরম দুর্ভোগে কেন পড়তে হবে।

কলকাতার ভিড়ের বাস যে কত নির্দোষ নারী পুরুষকে অকারণ নানা সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়— কত নারী যে সতীত্ব নিয়ে ভিড়ের বাস থেকে নামতে পারে না, তাকে পুরুষের শিকার হতেই হয়— এই যখন অবস্থা, সে এক বিকেলের শিফট শেষ করে বের হয়ে দেখে রাস্তাঘাটের মোড়ে মোড়ে ভিড়।

ঝির ঝিরে বৃষ্টি। দশটা বেজে গেছে।

সারাদিনই বৃষ্টি বাস স্ট্রাইক।

সরকারি বাস শুধু চলছে। হাতের কপি শেষ করতেও দেরি হয়েছে।

নয়

সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টি। কখনও ঝড়ো বাতাস। সারাদিন আকাশ ভার হয়ে আছে অভিমানি বালিকার মত।

সারাদিন মানুষ বাসের অপেক্ষায়। বাস নেই, মিনিবাস নেই। দু-একটা স্টেটবাস মাঝে মাঝে চোখে সর্ষেফুল ফুটিয়ে উধাও। ভিড় উপচে পড়ছে। বাস থামছে না।

কাঁঠালের কোয়ার মত মানুষ পা-দানি থেকে বাসের সর্বত্র ঝুলছে।

সরকারি বাস এখন ভগবান— অথবা কোনও বেগবান ঘোড়া মানুষজন হা হা করে ছুটে গেলেও থামছে না। চোখের সামনে পলকে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। অফিস শেষে তারও সবার মত বাড়ি ফেরা জরুরি।

অফিসে বসেই অঙ্ক কষে হিসাব করে বের করতে হবে কতটা উজানে যেতে হবে। কতটা উজানে গিয়ে বাস ধরতে হবে। লাস্ট বাস পেতে হলে কতটা উজানে যেতে হবে অঙ্ক কষে বের না করলে বিপাকে পড়ে যাবে। শ্যামবাজার মোড়ে গিয়ে লাভ নেই। গত তিনদিন ধরে বেসরকারি বাস-ধর্মঘট চলছে। দু-দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে বিবেচক মানুষেরা স্ট্যান্ডে গিয়ে বুজরুকের মত বাসের অপেক্ষায় থাকে না। অঙ্কের মত জীবনটাকে হিসাব করে চালাতে না পারলে প্ল্যাটফরমে ফেলে রেখে গাড়ি চলে যায়।

সে বুঝে ফেলেছে ধূর্ত ধান্দাবাজ মানুষের রাজত্বে আসলে অঙ্কের হিসাবটাই বড় হিসাব। গত দু'দিন হিসাবে ভুল করায় রডে ঝুলে জ্যাংরায় ফিরেছে। রডে ঝুলেই ছিল, ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেনি— কারণ জীবনে তার এক বাস আরোহিণী নিতম্বিনী-র আতঙ্ক আছে। কোথায় কার হাত লেগে যাবে, আর লাগলেও যে দোষের না, এত ভিড়ে, ঠেলাঠেলিতে কারটা কোথায় ঢুকে যাবে সে এক বিষম বিপদ।

জীবনের সেই দিনের আতঙ্ক ভিড়ের বাস দেখলেই তাকে কাবু করে ফেলছে। আজ সে খুবই সেয়ানা। ভেতরে ঢুকে সিট দখল করে ফেললে ছোঁওয়াছুঁয়ির দোষ থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

ঝড়বৃষ্টির জন্য দু-পাশের দোকানপাট বন্ধ। সেজন্য এক প্যাকেট সিগারেট আগেই অফিসে আনিয়ে রেখেছে। সামনে অন্ধকার। বোধহয় লোডশেডিং। এই এক নতুন অসুখ। ফলে অন্ধকার এবং কখন দূরে চিৎপুর ইয়ার্ডে রেলসান্টিং-এর শব্দ।

সে মনে মনে ফের অঙ্ক কষা শুরু করল।

প্রথমে যোগ। তারপর বিয়োগ।

শেষে গুণভাগ করে বুঝল বাসে ঠাঁই পেতে হলে মোটামুটি উজান দিতে হবে গৌরীবাড়ি পর্যন্ত। সেখানেই খালি হয় বাসটা। দু'একজন যাত্রী থাকে যারা খালপাড় পর্যন্ত আসে।

দু-দিন ধরে গৌরীবাড়িতেই উজানে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা বাস বোঝাই করে ফেলে। দু-দিন গিয়েই দেখেছে বাস যাত্রী বোঝাই। তিল ধারণের জায়গা নেই— রড ধরে ঝোলাঝুলি চলছে। কাড়াকাড়ি চলছে রডের নাগাল পাবার।

রাত ন'টার শিফট সেরে বাড়ি ফেরা।

রাতের কাজ শেষ করতে তার একটু বেশিই দেরি হয়েছে।

সুতরাং সে স্থির করল মোটামুটি তাকে উজান দিতে হবে গৌরীবাড়ি পর্যন্ত। যাত্রী নামার মুখে কায়দা করে ভিতরে গলে যেতে হবে।

এই ভেবে সে খালপাড়ের স্ট্যান্ডের দিকে গেল না। গিয়ে লাভ নেই। সরকারি বাস বাঘের মত ছোটে। যাত্রী তোলার দায় নেই। উঠতে পারলে ওঠো, না উঠতে পরলে দাঁড়িয়ে থাকো। জনদরদি সরকারের বাস। জনগণকে তোলারও দায় নেই, নামিয়ে দেওয়ারও দায় নেই। স্বাধীন।

সে হেঁটে গৌরীবাড়ি স্টপেজে এসে দাঁড়াল। গোটা তিনেক স্টপেজ উজিয়ে আসা এবং তীর্থে বের হওয়ার মত প্রতীক্ষা। গিজ গিজ করছে মানুষজন বাসের আশায়। টিপ টিপ বৃষ্টি, কখনও ঝড়ো হাওয়া। মানুষজন অতি কষ্টে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা সে পবিত্র এক জ্যোতির্বলয় দেখল। প্রথমে ধন্দ সত্যি তিনি পারাপারের কাণ্ডারী কিনা। তারপর কাছে আসতেই যখন বুঝল সাক্ষাৎ ভগবান হাজির এবং ভগবানের গায়ে এঁটোলি পোকারা লেগে নেই, হাল্কা তিনি— তখন আর দেরি না। কপালে থাকলে বসার জায়গা পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারে। লাস্ট বাস কিছুতেই ছাড়া যায় না। না আর ভাবতে পারছে না। সে লাফিয়ে উঠে গেল। আর হতবাক সামনের সিটে কোথা থেকে কারা সব বডি ফেলে দিল।

মুহূর্তে সব সিট দখল।

সে বুঝতে পারল, যারা সিট দখল করে ফেলল, তারা তার চেয়েও সেয়ানা। তারা উল্টোডাঙার পুল পর্যন্ত উজান দিয়েছে বাসে জায়গা পাওয়ার জন্য। তার ছটফটানি দেখে জায়গা দখল করা একজন যাত্রী হাই তুলতে তুলতে বলছে, 'মা তারা'।

বাসটা খালপাড়ে স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। লোক ভর্তি হয়েই আছে, তবু কিছু খুচরো যাত্রী যেখানে যেটুকু জায়গা পেল সেঁদিয়ে গেল। এবার ভাটার দিকে ফের রওনা দেবার পালা।

গৌরীবাড়ি হয়ে, উল্টোডাঙা পুল পার হয়ে ভি আই পি ধরে ছুটবে বলে বাস ফের দম নিচ্ছে।

সিটগুলো উল্টোডাঙা থেকেই দখল হয়ে আছে। ইতস্তত দু একটা মেয়েদের সিট গৌরীবাড়ি পর্যন্ত খালি। উল্টোডাঙার পুল আসতেই জোর করে

গাড়ি থামিয়ে ধুম ধারাক্কা— উঠছে, মেয়েদের সিটও খালি নেই— এবং আরও যুবতী মেয়ে ঠেলে ঢুকছে, একেবারে ত্রাহী মধুসূদন অবস্থা। মুহূর্তে ঠেলাঠেলি, পা চালাচালি। সে বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছে। মেয়েরা স্বাধীন, সিট নেইতো কী হয়েছে, সামনে পেছনে পুরুষ নারী ভেদ থাকছে না। সঙ্গে সঙ্গে সে কুঁকড়ে যাচ্ছে— সেই মুখ, বাড়িতে কি মা বোন নেই!

কিন্তু কি করা, নামাও যাচ্ছে না। লাস্ট বাস, আট দশ মাইল এই দুর্যোগের মধ্যে হেঁটে যাওয়া খুবই কঠিন।

সে যে কি করবে বুঝতে পারছে না।

কেমন হতভম্ব হয়ে মাঝখানে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

বাস ধর্মঘটের তৃতীয় দিন। এত সাফোকেশন যে দম নিতে পারছিল না। আজ সে রড ধরে দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছে। এবং কৃতার্থ এই ভেবে একটু ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাসও গায়ে লাগছে।

যাইহোক অক্সিজেন এবং বাতাসের আর্দ্রতা মিলে তার অন্তত নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে না। এইটুকু সম্বল করে সে একবার জানলায় উঁকি দিতেই দেখল, স্ট্যান্ডে লোক গিজ গিজ করছে। এখনও হুড়মুড় করে উঠে আসার চেষ্টা করছে— পারছে না। পাল্টা কিক খাচ্ছে বাসের ভেতর থেকে। এমন যখন অবস্থা— কাঁঠালের কোয়ার মত ছিটকে এসে পড়ল এক নারী। সঙ্গে জরুলের মত লটকে আছে তার সব আন্ডা বাচ্চা। এক হাতে পোটলা সামলাচ্ছে, অন্যহাতে আন্ডাবাচ্চা। সব কটা কোমর ধরে ঝুলছে আর কাঁই মাই শুরু করে দিয়েছে ভিড়ের চাপে। একটা কোলে, বাকি দুটো হাঁটুর ফাঁকে। আঁচলে মুড়ির পুঁটলি। ছিন্ন বাস। চুল রুক্ষ। কোথায় যে মরতে রওনা হল কে জানে। তার মধ্যে নানারকমের কুটকামড়। 'বাড়িতে কি মা বোন নেই।' এই আতঙ্কও কম নয়। যা অবস্থা, কেউ পেছনে ঠেস দিয়ে আছে, কেউ সামনা সামনি, নারী পুরুষ নির্বিশেষে যেন পিণ্ড পাকিয়ে যাচ্ছে। আর তার মধ্যে সেই রুক্ষ চুল, ভিখারি মেয়েটা। না কি এরাই আসল ভারতবর্ষ। যাইহোক সে খুব বিরক্ত হয়ে না বলে পারল না, তুমি মেয়ে আর সময় পেলে না!

তারপরই মনে হল, এটা তার বাড়াবাড়ি। যে যার মরণ গলায় ঝুলিয়ে ছুটছে। কিছু করার নেই। কি দায় পড়েছে তার এত ভাবার। আসলে সে বলতে চেয়েছে, এই দুর্যোগে বার হওয়া কেন! ভিড়ে গুঁতোগুঁতিতে বাচ্চাগুলি আবার চিড়ে চ্যাপটা না হয়ে যায়।

কারণ সে বুঝতে পারছে যাত্রীসাধারণ বাড়ি ফেরার জন্য এখন মরিয়া।

ফিরতে পারলেই হল। জায়গা মিলে গেলেই হল। কে পড়ে থাকল কে ঝুলছে, কে চিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে অত দেখার দায় কে নেয়।

তবু সর্তক থাকা ভাল। নারীজাতির কোনও অপমান হয়ে গেলেই মুশকিল— সেই এক কথা, আপনার কি বাড়িতে মা বোন নেই।

সে নিজে আত্মরক্ষা নিমিত্ত দু-হাতে শক্ত করে রড ধরে আছে। হাত ফসকালেই গেছে— ভিড়টা তার ওপর চিনের প্রাচীরের মত ভেঙে পড়বে। সুতরাং বাসে ভিড়ের গাদাগাদি, আর তার মাঝখানে এক ছিন্নমূল নারী। কোথায় যে শেষ পর্যন্ত ছিটকে পড়বে। হাতল নাগাল পাচ্ছে না। ভিড়ের মধ্যে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলাচ্ছে, বাচ্চা সামলাচ্ছে। শাড়ি সামলাচ্ছে। সব চেয়ে ভয় হচ্ছিল চোখের সামনে কোনও হত্যালীলা না দেখতে হয়। এত ভিড় যে সে ঘাড় পর্যন্ত ঘোরাতে পারছে না। সব লম্বা লম্বা হাত তার কাঁধের ওপর দিয়ে রড নাগাল পাবার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সে বুঝতে পারল কেউ তার পায়ের ওপর ভর দিয়ে রডে ঝুলে আছে। এধার ওধার, কারও মাথায়, কারও পিঠে একেবারে যেন ধানের বস্তা হয়ে আছে সবাই। আর এই বস্তুসমূহের ভেতর থেকে এক যুবতী তার সামনে ঠেলা মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। খেয়েছে!

সে যুবতীর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। সেই আতঙ্ক— বাড়িতে কি মা বোন নেই!

সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাসটা ছাড়ছে না।

একজন বলল, দুগগা দুগগা।

বাস কি ছাড়ছে?

মা জননীর কোলের বাচ্চাটা হাই ফাই করে আর বাতাস টানতে পারছে না। অক্সিজেনের অভাব এখনই ছটফট করছে, হাত পা ছুঁড়ছে, এবং চেঁচাচ্ছে।

অপুষ্টিজনিত কান্না।

কে একজন ফোড়ন কাটল।

আরে মরে যাবে যে। করছেন কি? মা জননী সামনে এগুতে পারেন কি না দেখুন।

আহাম্মক! মিহিরের এমনই মনে হল।

না ধুরন্দর! লোকটা আয়েস করে বসে উপদেশ ঝাড়ছে। নিজে উঠছে না। উঠে বলছে না মা জননী আপনি বসুন। বসে বাচ্চাটাকে বুকের দুধ

খাওয়ান। আসলে এই অপুষ্টিজনিত কান্না সবার কাছেই বিরক্তিকর— কি সরকারের কাছে কি বাবুদের কাছে।

তারও রাগ হচ্ছিল।

ঘায়ের জ্বালায় কুকুর পাগল— আর সময় পেলে না। এই দুর্যোগের মধ্যে বাচ্চা নিয়ে বাস ধর্মঘটের দিন বের হয়ে পড়লে! তার আরও মনে হল কুকুরের পাল নিয়ে বাসটি ঝিমুচ্ছে। সেও শালা কুকুর— বেজন্মার বাচ্চা না হলে সে তো কোনও রকমে আলগা হয়ে দাঁড়ালেই, জননী মাথা গলিয়ে জানলার সামনে চলে আসতে পারে। ঝিরঝির বাতাসে বাচ্চাটার তবে আর কষ্ট হয় না। সে পারছে কই! সেওতো আতঙ্কে আছে। কোথাও যদি কোন নিতম্বওয়ালি থাকে, ঠাসাঠাসি বাসে নড়তে গিয়ে কিংবা সরতে গিয়ে যদি পেছনে হাত লেগে যায় তো হয়ে গেল— আপনার কি বাড়িতে মা বোন নেই! আর ভিড়ের ভেতর শ্বাসরোধ হয়ে কে মরতে চায়।

সিরাজের, সিরাজের বা মিরজাফরের, না মীরকাশিমের—কার সময়। এই অন্ধকূপ হত্যা। সেই হত্যার সময়েও মনে হয় ঘরে এর চেয়ে বেশি ফাঁকা ছিল। অন্ধকূপ হত্যার সময়ও ঘরে এর চেয়ে বেশি গাদাগাদি লোক ছিল না।

এখনও ঠেলা খাচ্ছে।

ওর শরীরে নানারকম ভঙ্গী অথবা বলা যায় ত্রিভঙ্গরূপ ফুটিয়ে তুলেও নিস্তার পাচ্ছিল না। ঠেলা খেতে খেতে সে বাসের মাঝখানটায় এসে গেছে এবং সামনে সেই এক নারী। ওপরের হাতল ধরার চেষ্টা করছে। সামনের যুবতী তাকে যেন ঠেলে ধরছে। নারী প্রত্যঙ্গ এবং পুরুষ প্রত্যঙ্গ প্রায় বরাবর। এক দেড় সেন্টিমিটারের তফাৎ।

সামনে বসে থাকা মা তারা যাত্রীটি বাইরের রূপ দেখছে। বিলক্ষণ টের পেয়েছে সবাই আস্ত না পৌঁছালেও সে পৌঁছাবে।

তখনই কে যেন বলল, আরে পা ঠিক করে রাখুন। পায়ে ঠেলছেন কেন?

কেন আমার মাথায়। কোথায় রাখব! আরে পা চেপ্টে গেল। ও হো হো গেল গেল!

উদাম লোকটি সিটে বসে সুখযাপন করছে। ঘুম ঘুম চোখে সে ফের বলল, মা তারা।

পাশের সিটে কোথাও ত্রিপুরা নিয়ে বচসা শুরু হয়ে গেছে। বসার জায়গা পেয়ে পলিটিক্যাল ম্যান সব। কে কত খবর রাখে তার তর্জা চলছে। আর সে আছে রডে ঝুলে। কোমর সামান্য নেমে গেলেই যুবতীর তলপেট বরাবর

হয়ে যাচ্ছে তার প্রত্যঙ্গ। এক দেড় সেন্টিমিটারের তফাৎ। সে তার পা-এর ওপর ভর করে সামান্য লম্বা হতে চাইছে—মধ্যবর্তী স্থানটুকু বজায় থাকুক, এক পাছাওয়ালি যে-ভাবে গালাগাল করছিল, তার আতঙ্কে পায়ের পাতার উপর ভর করে লম্বা হয়ে আছে। নামলেই ঠেসাঠেসি। সেতো শত হলেও মানুষ—দুটো পর্বত শৃঙ্গের মত স্তন তাকে খাব খাব করছে—সে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। দূরত্ব বজায় রাখছে।

কতক্ষণ পারবে সে জানে না।

দেড় দু-ডেসিমেল জায়গাও থাকছে না।

বার বার ঘন্টা বাজাচ্ছে কেউ।

দেড় দু-ডেসিমেল দূরত্ব এখনও ঠিক আছে।

ভেতরে কেউ কেনাস্তারা বাজাচ্ছে। বাসের বডিতে কেউ লাথি মারছে।

ঘন্টা টানছে। গালাগাল দিয়ে সরকারের গুষ্টির তুষ্টি করছে।

এহ বাহ্য। কেউ বলল, তারা চললেন। অলিম্পিকে মজা লুটতে চললেন।

জনগণের পয়সায় খেলার নামে টাকার শ্রাদ্ধ।

আরে লোকটাতো দশবছর আগে পাড়ায় মস্তানি করত, এখন মন্ত্রী।

মধ্যবর্তী স্থানটুকু রক্ষা করার জন্য বলল, একটু সরে দাঁড়ান না।

যুবতী বলল, আপনি সরে দাঁড়ান না।

অবশ্য এত ঠেসাঠেসি যে হাতল না ধরেও লম্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। তার অসুবিধা হাতল না ধরলে মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটুকু আর থাকে না। কারা কথোপকথন চালাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে না।

আসলে ওদের বসার জায়গা মিলে গেছে। না হলে পলিটিক্যাল টেম্পো বাসের এই অন্ধকূপে তুলে দিতে পারত না। এত টিমটিমে আলো যে কখন আবার নিভে যায়। সে পা উঁচু করে রেখেছে। পা নামালেই মধ্যবর্তী স্থানটুকু লোপ পাবে। তখন সে মানুষ না ভেড়ার পাল বুঝতে পারল না। সিটে বসা উদাস লোকটি এই বুঝি ফের হাই তুলবে। তার কেন যেন লোকটির মুখ দেখে এত আতঙ্ক বোঝে না। মা তারা বললেই সপাটে মুখে লাথি—তামাসা দেখা হচ্ছে। অবশ্য তারও উপায় নেই। সে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যবর্তী স্থানটুকুর দূরত্ব বজায় রাখার জন্য, তার মাজা ধরে গেছে। তা ছাড়া পা তুলে ফেললে ফের রাখার জায়গা পাবে না। দখল। আরে মশাই করছেন কি! পায়ে লাগছে সরান। পায়ে লাগছে সরান। আবার মা।

কোথায় রাখব বলুন না।

বলেছিত, মাথায় রাখুন। পারেন তো সরকারের মাথায়। আমরা কি আর মানুষ আছি। বুঝতে পারছেন না জন্তু জানোয়ার হয়ে গেছি।

যুবতীর ঘ্রাণ সে পাচ্ছে। চুলের ঘ্রাণ। ভিড়ের মধ্যে সে কিছুটা এতে আরাম পাচ্ছে।

আরে রাগ করে কি হবে? কে একজন ফুটকরি কাটল।

তাই বলে আমার পায়ে ভর করে দাঁড়াবেন!

এক পায়ে কতক্ষণ দাঁড়াই বলুন তো?

কে যেন ভিড় থেকে টিপ্পনি কাটল, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সরকার আছে বলে। সরকার ওল্টালে তাও থাকবে না।

আগে থেকে পা রাখতে পারলেন না কেন?

ঠিক রেখেছিলাম। ঠেলাঠেলিতে পা হড়কে গেছে।

জায়গা যখন পাচ্ছেন না, এক পায়েই দাঁড়িয়ে থাকুন।

সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারছিল না। চিৎকার করে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল। সে পা রাখল ঠিক, তবে মধ্যবর্তী দেড় দু সেন্টিমিটার দূরত্ব রাখার আর সুযোগ থাকল না। শরীরের সঙ্গে শরীরের ঠেসাঠেসি হয়ে গেল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে পিষ্ট হচ্ছে সে বুঝতে পারছে—সে না পেরে মেয়েটাকে বলল, একটু পাশ ফিরে দাঁড়ান না।

সেটাতো আপনিও পারেন।

সে বলল আবদার। আর সে বুঝল পা নিয়ে যখন প্রবলেম শুরু হয়েছে, এখন হাত উঠবেই।

কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে! সে আত্মরক্ষার্থে কারণ মধ্যবর্তী দূরত্বটুকু মুছে গেছে, কিছু যদি হয়ে যায়, সে কোনওরকমে একটু সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল—কিন্তু নড়তেই পারছে না। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে একেবারে পাথর হয়ে আছে সব। সুতরাং যা হয় হবে। পা-জামা নষ্ট হলেও কিছু করার নেই—আর সেই চুলের ঘ্রাণ, স্তনের ঠাসাঠাসি—সে নড়ে কি করে! এখন তার ঈশ্বর ভরসা। সে মনে মনে উচ্চারণ করল লাভ ইজ কাইন্ড।

তারপর বলল, লাভ ইজ গড।

শেষে না পেরে বলল, লাভ ইজ প্যাশান।

দেখাই যাক না, কতক্ষণ সে পারে।

যুবতীও যে খুব স্বস্তিতে নেই সে বুঝতেই পারছে— ঠেলা খেয়ে [illegible]কিল

হজম করার মত তার কোমর কিঞ্চিত যে ওঠানামা করছে বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে না।

তিন শিশুই গরমে ঠাসাঠাসি ভিড়ে ফাঁপড়ে পড়ে গেছে। চিহি চিহি কান্না—জননীর চারপাশে যারা আছে তাদের অকাতরে সুপরামর্শ—নেমে যাও বাছা। কেন বের হও। জান না বেসরকারি বাস ধর্মঘট। জান না, গুঁতোগুঁতিতে তোমার একটা আন্ডা বাচ্চাও আস্ত থাকবে না।

তা আস্ত নাও থাকতে পারে। জন্তু জানোয়ারের লম্বা লম্বা ঠ্যাং তার ফাঁক্‌ফোঁকরে মুখ গুঁজে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে তার আন্ডা বাচ্চারা। মধ্যবর্তী দেড় দু সেন্টিমিটার দূরত্ব কমছে। আতঙ্ক, কিছু না হয়ে যায়! কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। সে কিছুতেই কোমর সরাতে পারছে না। পাথরের চাপ আরও বাড়ছে। তার শিশ্ন ফুলে উঠছে।

সে যে কী করে!

আর তখনই জননীর কোলের বাচ্চাটা বাস্পি সেরেছে। দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। এতে জননীর সুবিধা কিছুটা, পাশের লোকজন সটকান দিতে চাইছে। কিন্তু সে নড়ছে না। কিন্তু সেই পাছাওয়ালির আতঙ্ক তাকে যে তাড়া করছে। এই ফাঁকে সেও কিছুটা আত্মরক্ষার উপায় পেয়ে গেল। অন্তত খাপে খাপে লেগে নেই। কিছুটা আলগা হওয়াতে এবং বোধ হয় মলমূত্রের দুর্গন্ধে কিছুটা অন্যমনস্ক হওয়ায় শিশ্নের গোমর আর থাকছে না।

সে আত্মরক্ষা করতে পারছে।

কিন্তু যুবতী পারছে না। এই একটা আরাম যুবতীর এখনও বোধ হয় আছে। ওফ্ কী জ্বালা। আরে সরে দাঁড়াও।

জননী কাঁথা পাল্টাচ্ছে।

আরে করছ কি! গোটা বাস গুয়ে মুতে ভাসাবে দেখছি।

আর একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হল বলে অন্ধকূপে। শুধু যারা বসে আছেন, তারা অন্য কলহে মত্ত। পিকনিকে যাওয়ার মত, রুমাল উড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান—গৌতম যা এবার খেলবে না! মহমেডান শিল্ড ফাইনালে। আরে লটারি না ছাই, সব গটআপ বোঝলেন না! আসলে শোষণ।

তার কানে বরফের কুচির মত কথার সূঁচ ঢুকে যাচ্ছে। কে বলছে কাকে বলছে, কোথা থেকে বলছে সে বুঝতে পারছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার উপায় নেই। ঘাড় ঘোরাতে গেলেই হাই হাই করে উঠছে সবাই।

বাইরে সেই দুর্যোগ চলছে। বৃষ্টি ঝড় দুইই প্রবল বেগে ধেয়ে যাচ্ছে।

মশাই আপনি জানেন, মাইলাইতে দশ হাজার লোক খুন হয়েছে।

ও কাগজের খবর। বাদ দিন। কাগুজে গল্প শুনবেন না মশাই।

কী বললেন! কাগুজে গল্প! জানেন মাইলাই-এর চেয়ে নৃশংস ঘটনা এ দেশে আর কোথাও ঘটেনি। মেয়েদের যোনিতে বল্লম ঢুকিয়ে দিয়ে মেরেছে, কেটেছে। স্তন তীরবিদ্ধ হয়েছে। মিলিটারি নামিয়ে কি করল! কচু করল।

কচু করল! ভিড়ের মধ্যে কাটা কাটা কথা। তার থুতনির নীচে সুনিতম্বিনীর মুখ।

আপনার দলের লোক। কারা আবার!

আপনার দল বলছেন কেন?

কী বলব তবে?

আপনি ধোওয়া তুলসিপাতা। বাঙালীর বিরুদ্ধে কে লেলিয়ে দিল বাঙালী জাতিকে শেষ করে দিচ্ছেন আপনারা। আপনাদের মুখে আবার বড় বড় কথা!

আর আসামে! আসামে মহারানী কি করলেন! বাঙাল খেদা চলছে। কী করতে পারছেন!

রাখেন আসামের কথা! জনতাই তো সব ছত্রখান করে দিল। একবার উদ্বাস্তু হয়ে দেশ ছেড়েছে, ফের বাঙাল খেদার পাল্লায় পড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। যতসব দালাল এসে জুটেছিল।

একজন কোথা থেকে বলল, বাঙালি জাতির সমূহ সর্বনাশ।

এগারো

আবার কে একজন ফোড়ন কাটল, দ্যাখেন দাদা একটা কথা বলছি। দালালেরা আছে বলেই পার্টি টিকে আছে। নেতাদের চরিত্র হনন শুরু হয়েছে বুঝতে পারছেন না, কেন হচ্ছে! ভোট হলগে কাল। আমায় ভোট দাও, তোমায় সগগে নিয়ে যাব। তারপর কলাপাতায় খিচুড়ি—তাও জোটে না।

অনাহার অর্ধাহার চলছে তো চলছেই। ধুরন্ধর লোকরাই নেতা হয়। মাঝপথে সরকারি টাকা হাপিস করে দেয়। এই হল গে দেশ, জাতি, মনসামঙ্গল।

মা তারা!

আর তখনই বাসটা স্টার্ট নিল। বাসের জানালা দরজায় সর্বত্র এঁটোলি। পোকা থিক থিক করছে।

মিহির ভাবল এই জন বিস্ফোরণের উপায় কি।

উপায় একটা আছে অবশ্য, আইন করে প্রত্যেক নারীর নাড়ি কেটে দিতে হবে। একটা সন্তান, তারপরই। কিন্তু আইনটা করে কে। আইন করলেই জাতি দাঙ্গা যে শুরু হয়ে যাবে।

ভাবতে গিয়ে তার মাথা গুলিয়ে উঠল।

সেই নারী স্টার্ট খেয়ে আরও সেঁটে গেছে তার বুকের কাছে। ফলে মেয়েটির কোমর, তলপেট, পা'ও সেটে গেছে প্রবলভাবে।

মিহির যে কিভাবে সরে!

অন্যমনস্ক থাকা ছাড়া তার উপায় নেই। তার বীর্যপাত হয়েই যেতে পারে। সে বাসের মাঝামাঝি জায়গায়। হাতবাড়িয়ে যে জননী এবং তার শিশুগুলিকে সামলাবে তারও উপায় নেই। তবে এতে অন্যমনস্ক থাকা যাচ্ছে। এই দৃশ্যচিন্তায় সে অন্যমনস্ক থাকায় স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

শিশুগুলিকে কে সামলাবে, কারণ কখন পদপিষ্ট হয়ে এই শিশুগুলির লাশ পড়ে থাকবে কেউ বলতে পারে না। সে একজন সাংবাদিক, সাংবাদিকের চোখে এই ঘটনা খুবই নিষ্ঠুর। সেওতো ছিল বাসে। বলতেই পারে কেউ তিনি কি করছিলেন! কিন্তু হাত বাড়িয়ে যে জননী এবং তার শিশুগুলিকে সামলাবে তারও উপায় নেই। হাত নামাতেই পারছে না। একেবারে ইস্পাতের দেওয়ালের মত চারপাশ যেন জনগণ শক্ত হয়ে আছে। নামাতে গেলেই যুবতীর স্তনে প্রথম ধাক্কা খাবে। কিংবা পাশে তার এক নারী—তার পেছনে হাত ঠেকে যেতে পারে।

সে বুঝতে পারছে তার হাঁটুর পাশে জননীর শিশুরা খাবি খাচ্ছে। সে আতঙ্কে সিটিয়ে গেল। যাই ঘটুক অগ্রপশ্চাতে ঘটুক। এক বিন্দু হাওয়া ঢুকছে না। খাবি খাওয়া ছাড়া শিশুগুলির আর কিছু খাওয়ারও নেই। মিহির কার কাছে যে কামনা করেই চলেছে, যাই ঘটুক অগ্রপশ্চাতে ঘটুক সামনে যেন না ঘটে।

অন্যত্র মহিলা আসরে নারীরা বসে আছেন। পান জর্দা খাচ্ছেন, হাসি মসকরা চলছে। যুবতী নারী কারও কানে কানে কি যেন ফিস ফিস করে বলছে। যুবতী নারীরা কেউ কেউ ভিড়ের মধ্যেও পড়ে গেছে। নিজেরাই ঠেলাঠেলি করছে। গালমন্দ করছে বাসের কন্ডাক্টারকে। কেউ যেন মুচকি হাসছে তাও শোনা গেল।

কে বলেছে, এমন বাদলার দিনে আপনাদের বের হতে!

আসলে সে অন্যমনস্ক থাকার জন্য নানান কথার মধ্যে মজা খুঁজছে। এ ছাড়া যে তার আত্মরক্ষার উপায় নেই। একবার উগলে দিলে তার পাজামা পাঞ্জাবি নষ্ট হতেই পারে—অন্য কারও জামা কাপড়ে যে লেগে যাবে না তাও বলা যায় না।

কে যেন তার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির গল্প জুড়ে দিয়েছে। শ্বশুর ব্যাটাকে হারামজাদা, বলছে। তারপর মুখে কৌটা খুলে এক টিপ জর্দা ফেলে দিচ্ছে। মেয়েকে কি পরামর্শ দিয়ে এসেছে, তাও বলছিল। —বাড়ি ছাড়বি না। দখল রাখ। কেউ এলে ঢুকতে দিবি না। অতিষ্ঠ করে তোল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব রাখ। আত্মীয়স্বজন এলে ওদের সামনে শ্বশুরকে গলবস্ত্রে প্রণাম করবি। আত্মীয়স্বজন চলে গেলে লাথি মারবি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলবি। টোপ যখন গিলেছে, কী করে খেলিয়ে তুলতে হয় জানি।

মিহির শুনছিল।

সে ভাবছিল—এই হল জনগণ।

তার কপালে ঘাম দেখা দিচ্ছে।

আবার পা।

কোথায় রাখব বলুন। যেখানেই রাখি পায়ের ওপর পা পড়ে যায়। যেখানেই রাখি পা উঠিয়ে নিতে বলে।

জোর করুন। বলুন দু-পায়ের একটা পায়ে অন্তত রাখতে দিন। কেউ রাজি না।

বলছিতো জোর করে রাখুন। পা মারিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে লাথি মারলে আপনি সজোরে লাথি কষান। এই হল আমাদের ভারতবর্ষ, বোঝলেন না। প্রতিবাদী না হলে পা রাখার জায়গা পাবেন না।

আরে দাদা লাথি যে মারব, তার জন্য খালি জায়গা লাগে। তাহলে আপনার পায়ে রাখি।

একজন কোথা থেকে ক্ষেপে উঠে বলল, আবদার!

সেই যে আবদার বলে লোকটা ক্ষেপে উঠেছিল, তারপরই মিহির দেখেছে—তার চারপাশের মানুষ, যাদের দুটো পা'ই সহজভাবে দণ্ডায়মান, তারা সবাই তাকে আরও এনক্রোচ করছে। যুবতীর কোমরের কাছে তার পেট ঠেসে গেছে।

বাইরে বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া, করাৎ করে কোথাও বাজ পড়ল। বাস অন্ধকার। এক পা ভরসা করে আর কতক্ষণ দাঁড়ানো যায়। সে আর না পেরে

অবলম্বনহীন পা-টা দিয়ে পাশের লোকটির তালপেটে একটা মাঝারি মাপের কোঁৎকা মারল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি হাউমাউ করে উঠল। কে মেরেছে। কে মারল। খোঁজ খোঁজ। কিন্তু কাউকেই সন্দেহ করা যাচ্ছে না। সামনে এত লোক, যে কেউ মারতে পারে। কিছুই তো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

সবার মুখ নির্বিকার—উদাসী রাজকুমার সব। পা রাখার জায়গা হয়ে যাওয়ায় মিহির যেন কিছু বোঝে না জানে না মত। পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, আপনার খুব লাগল!

পাশ থেকে কেউ বলল, ভিড়ের বাসে এক আধটু লেগেই থাকে।

মা তারা!

যারা ত্রিপুরেশ্বরী নিয়ে মসগুল ছিল তাদের দিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে কথাটা। বাসে ওঠার পর থেকে শুরু হয়েছে, এখনও চলছে। তখনই কে যেন আবার বলল, এত মা তারা কে করছে রে! বাবা তারকেশ্বরের কাছে চলে যাও না বাওবা! কথার ঢং-এ বোঝা গেল, এই বাসে একজন নেশাখোরও উঠে গেছে। কেউ বলল শালা পয়মাল। আর জায়গা পেলি না বাসে উঠে পড়লি। এখন শালা বমি করে ভাসালেই তো গেছি!

আর একজন বলল, আসলে বোঝলেন না বাঙালী দেখলেই এখন লোক খেপে যায়। চোর বাটপার ধানদাখোর ভাবে। আসামীদের দোষ দিচ্ছেন কেন। একসময় ছিল যেখানে ইংরাজ সেখানেই তল্পিবাহক বাঙালি। উকিল, কেরানী-মোক্তার সবইতো বাঙালীবাবু। শালা এটা একটা জাত! পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি ছুঁড়তে ওস্তাদ। শুধু শোষণ—আসামের জনগণ সইবে কেন! তাদের রাজ্যে, তারা মাইনরিটি হয়ে যাচ্ছে, সহ্য করবে কেন। ভেবেছিল দেশ স্বাধীন হলে ইংরাজরা চলে যাবে, তল্পিবাহকরাও চলে যাবে। একজনও গেল! উল্টে অনুপ্রবেশ শুরু। বাঙালী অনুপ্রবেশ। মানবে কেন তারা। পেটা শালাদের।

দোষ দিয়ে লাভ নেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবী ঠাকুরের নামাবলি গায়ে দিয়ে আর কতদিন চলবে! নিজেরা তোরা কি করছিস!

একজন বলল, কেন লাঠালাঠি করছে। বন্ধ করবে। ধর্মঘট করবে।

আবার একজন বলল, বন্ধ পালন করছে।

সরকারি বাসের অবস্থা দেখে বুঝছেন না, বাঙালীর কী অবস্থা! আর এ-জাতের বড়াই করা মানায় না।

একজন বলল, হবে। সব ক্ষেত্রে গরীব-গুরবো থাকবে না। জ্যোতিবাবুর হাতে সরকার গেলেই বুঝতে পারবেন কর্মযজ্ঞ কারে কয়!

কাকে দিয়ে করবে? সেওতো আপনি আমি। কামচোর বাঙালী।

আর তখনই আর এক রাজনৈতিক অস্থিরতা। নারীকণ্ঠ। ভিড়ের মধ্যে চেঁচাচ্ছে। ইতরামি। জুতিয়ে দু-গাল ফরসা করে দেব।

মিহির বলল, কি হল দিদি!

তোমার মাথা। মারব। মেরে সব কটা দাঁত ফেলে দেব। ইতরামি। বাড়িতে মা বোন নেই! ওদের টিপতে পার না।

একজনের পশ্চাৎ, আর একজনের বক্ষ। সে তো কারও স্তনে হাত দেয়নি। ইচ্ছে থাকলেও হাত তোলা যায় না। শুধু কোমর আর পেট ঠেসাঠেসি হয়ে আছে। সে এবং একজন যুবতী সামনা-সামনি। চারপাশের ভিড় পাথরের দেয়ালের মত। কারও নড়ার ক্ষমতা নেই। একটু নাড়ানাড়ি হলেই প্রাণসংশয়। তার শিস্ন কি ফুলে উঠেছে! তাও তো নয়। তবে!

আর তখনই দেখল বাস বাঙ্গুরে এসে গেছে। বাস স্টপেজে থামতেই আর থাকে! যুবতী তার দিকে তাকিয়েই চেঁচাচ্ছে। আর সে থাকে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য হুড়মুড় করে লাফিয়ে নেমে গেল সে।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তার পেছনে ছুটছে সেই নারী। হাতে একখানা চটি। আঁচল খসে পড়ছে। উন্মত্তের মত ছুটছে।

বাসটা ছেড়ে দিল। ঝড়ের বেগে বাস তাদের সামনে দিয়ে ছুটছে।

একজন বলল, বলাৎকার।

কাকে?

দিদিমণিকে। দেখুন ছুটছে।

বাসের একজন বলল, এই দুর্যোগে যাবে কোথায়?

একজন বলল, বলাৎকার বললেই বলাৎকার হবে! তার আইনি প্রমাণ লাগবে না!

যে যতটা পারছে বাসের জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

আর তখনই জননী শিশু বগলে নিয়ে হড় হড় করে বমি করছে। যারা বসেছিল, উঠতে পারছে না। বমি কোলে নিয়ে বসে থাকল। দুর্গন্ধ, ভিড়, এঁটোলিপোকা, ত্রিপুরেশ্বরী, মাইলাই, হারামজাদা শ্বশুর নিয়ে সরকারি বাস চোখের ওপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারো

গল্পের বাসটাকে এবারে ছেড়ে দেওয়া যাক। কিংবা বলা যেতে পারে গল্পের শুরু কোনও শ্লীলতাহানির দৃশ্য থেকে তৈরি। যে দিকে চোখ যাবে, জনগণের শুধু এই এক দৃশ্য। কাজে কম্মে, উন্নয়নে, বেকার নিধনে, কর্মযজ্ঞে—সর্বত্রই মানুষের এই কষ্টকর যৌনতা এবং জীবন এবং কল্পিত সব গরিমার স্বপ্ন মিলে বেঁচে থাকা।

সবারই গৃহাগত প্রাণ।

সবাই যে যার গৃহে প্রত্যাবর্তন চায়। বেঁচে থাকার জন্য স্বার্থপরতাই সম্বল। আমার আমার সব আমার এই বোধ থেকে বেঁচে থাকা। অন্যের সুবিধা অসুবিধায় বিন্দুমাত্র কারও গ্রাহ্য নেই। গরীব গুরবো, অপুষ্টিজনিত বেঁচে থাকা নিয়ে কারও কিছু আসে যায় না।

এই যে বাসের ভিড় থেকে যে যার আত্মসম্মান রক্ষার্থে নেমে গেল এবং যুবতী হাতে চটি নিয়ে ছুটছে—খেয়ালই নেই, গভীর রাত—কারণ বাসটা লাস্ট বাস, এবং এরপর আর কোনও সরকারি বাসও যে পাওয়া যাবে না, উন্মত্ত অবস্থানে দু'জনের একজনও সে-কথা ভাবেনি। মনে রাখতে পারেনি এর পরিণাম কতদূর গড়াতে পারে।

ঝিরঝির বৃষ্টি।

দমকা হাওয়া, সঙ্গে ঝড়।

রাস্তাটা চওড়া। দু-পাশে ঘন গাছপালা, খাল, জঙ্গল। জঙ্গল পার হয়ে খাল পার হয়ে জলা জায়গায়, ভেড়ি ভরাট করে নতুন শহরের বিস্তৃত কাশবনের মাঠ। আর একদিকে শহর লেকটাউন, বাঙ্গুর, মানুষজনের মিথ্যের অহঙ্কার। রাস্তার আলোতে কিছুই স্পষ্ট নয়।

ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল মিহির।

যুবকের নাম এতক্ষণ মিহির ছিল, এখন কেন যে মনে হচ্ছে কেউ তাকে কপিল বলে সম্বোধন করছে।

যেন বলছে, এই যে কপিল পড়ে গেলেন কেন। খুব যে হিম্মত দেখাচ্ছিলেন!

সে মাথা উঁচু করে দেখল, কেউ কাছে নেই—নির্জন রাস্তায় ফেলে তাকে নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে, সে তাকে কপিল বলে ডাকতেই পারে। সে বলতে পারত দেখুন আমি কপিল নই, বাসে যারা কপিল কপিল করছিল, সে অন্য

কপিল। তাকে আমি চিনি না। তিনি ক্রিকেট খেলেন। এখন আর কপিল নামের কোনও অর্থ হয় না। বাসটা তাদের ফেলে রেখে গেল। তারা নামগোত্রহীন জীবমাত্র বাসটা চলে গিয়ে টের পাইয়ে দিয়েছে। সেও বোধ হয় নেমে গিয়েছিল, বাসে থাকলে ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিত। মাথা গরম হয়ে গেলে যা হয়, এখন দুজনের মধ্যেই কিছুটা বোধ হয় দুর্ভাবনা—যদিও আচরণে টের পাওয়া যাচ্ছে না।

নারী এখনও রণচণ্ডী কিংবা চামুণ্ডা।

সে ছুটতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেছে। সারাদিন ধরে বলতে গেলে দুর্যোগ চলছে। রাস্তা পিছল।

আত্মসম্মান রক্ষার্থে জীবন হাতে নিয়ে ছুটতে হয় অকারণ। সে একদণ্ড আগেও টের পায়নি। সে জামাকাপড় সামলে উঠবার সময় দেখেছে হাতে রণচণ্ডীর চটি জোড়া ঠিকই আছে। রাস্তার আলোতে কিম্ভূতকিমাকার দৃশ্য। চারপাশের বনজঙ্গল রাস্তায় উঠে নাচানাচি করছে। তার ভেতরে তার ভূতের মত এক ভৈরবীও নৃত্য করছে। পিছলে পড়ে গিয়ে ঘাড়ে লাগতে পারে। আসলে সে চোখে সর্ষেফুল দেখছে। মাথাটা তার ভারি ঠেকছে ওঠার সময় তাও টের পেল। সে কী করল, আর সে যে ছুটতে থাকল কেন বুঝতে পারছে না। বাসের জিরো পাওয়ারের আলোতে সামনের মেয়েটির মুখ খুবই অস্পষ্ট ছিল, সে ঠিক বুঝতে পারছে না কার তাড়া খাচ্ছে সে। অন্তত এটুকু মনে আছে যুবতী শান্তশিষ্ট হয়ে তার শরীরের আরাম বোধ করছিল, সেই মেয়েটা যদি না হয়, তবে সে কে?

কে ধেয়ে আসছে। বাসটা অন্ধকার হয়ে গিয়েই যত বিড়ম্বনার সৃষ্টি।

মাথাটা তার ঝিম ঝিম করছে। তবু সে ওঠার চেষ্টা করল।

আসলে আতঙ্কে থেকে সব হতে পারে। সেদিনের বাসের আতঙ্কও হতে পারে। সে যাই হোক, তার মাথা ঠিক ছিল না। এখন যেন আরও নেই। সেদিনতো বাজারে ছেলেধরা সন্দেহে চোখের ওপর একজন বুড়ো মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল। পাইকারি মারের ধরন সে জানে।

মিহির সেদিন ছবি তুলতে গিয়ে বেধড়ক-ধোলাই খেতে গিয়েও বেঁচে গেল। খবরের কাগজের লোক হলে যা হয়।

পুলিশ জনতা থিক থিক করছে—অপরাধীরা কেউ আর কাছে নেই। কারা পেটাল, কারা ছেলে-ধরা সন্দেহে গলির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল, পুলিশের শত জেরাতেও কেউ মুখ খুলল না।

সে দেখেছে, বুড়ো মানুষটা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে।

মিহির তার নিজের মাথার পেছনে কি-ভেবে হাত দিয়ে দেখল—না রক্তপাত হয়নি।

বুড়োমানুষটি নিশ্চয়ই কারও বাবা, কারও স্বামী, তিনি যাই হোন ছেলেধরা সন্দেহে লাশ হয়ে গেলেন। কোমরের হাড়গোড় সব চুরমার হয়ে গেছে। কেউ বলছিল, ডাব কিনতে এসেছিল।

কেউ বলছিল, তরণীবাবুর নাতির সঙ্গে কথা বলছিল।

কী কথা বলতে পারে?

কত কথাই থাকতে পারে। বুড়ো মানুষ, শিশুদের দেখলে ভাল লাগারই কথা। জানা গেল বুড়ো জগতপুরের দিকে থাকেন। ঝুপড়ি মত একটা বাড়ি আছে—তারপর কি আছে মনে করতে পারছে না। ঘাড়ে অসহ্য ব্যথা। সে দাঁড়াতে পারছে না। তারপর ফের মনে পড়ল—খুবই গরীব, বাড়ির কেউ অসুস্থ।

না তার স্মৃতি হারিয়ে যায়নি।

পূর্বাপর সবই ঠিক মনে পড়ছে—মা বাবার কথাও তার মনে পড়ছে। জ্যাংরার দিকে একতলা বাড়িতে সে থাকে। নন্দ, সে না যাওয়া পর্যন্ত বাবুর অপেক্ষাতে জেগে থাকে।

আর বাসে কে ধর শালাকে বলতেই সে ভেবেছিল, হয়ে গেল? সেই বুড়ো মানুষ, লাশের গন্ধ। সে কেমন দ্রুত ইঁদুরের মত বাস থেকে নেমে পালাতে চেয়েছিল।

একবার যদি হাত উঠে যায়, আর একবার যদি মাথা পেতে উঃ লাগছে, সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না। বিশ্বাস করুন আমি কারও গায়ে হাত দিইনি—কেউ তার কথা বিশ্বাসই করবে না। যা ভিড় তাতে করে গোপনে ধর্ষণও হয়ে যেতে পারত। নারী পুরুষ একসঙ্গে ঠাসাঠাসি করে পরিবৃত হয়ে থাকলে যা হয়।

হাত দাওনি শালা! মার মার। সমাজের কলঙ্ক, অসভ্য ইতর বেজন্মার বাচ্চা। সে বুঝল তার উপায় ছিল না। কিন্তু একজন নারী এত রাতে হাতে চটি নিয়ে তাড়া করবে সে এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি। আসছে। এখন অবশ্য পাইকারি ধোলাই খাবার তার আর ভয় নেই। রাস্তাটা ভি আই পি বলেই রক্ষা।

দমদম পার্কের মুখে ঠিক নামেনি। তার কিছুটা আগে খেয়াঘাটের আগে

বাসটা থেমেছিল। দু-পাশেই নির্জন। খালের ওপরে দু একটা নতুন ঘরবাড়ি চোখে পড়েছিল। তবে এখন কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। সে না হয় আত্মরক্ষার্থে আতঙ্কে বাসের ঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছিল।

তাই বলে যুবতীও তার নাগাল পাবার জন্য ভিড় ঠেলে হাতে চটি নিয়ে নেমে পড়বে, এটা সে ভাবতে পারেনি।

তার মাথা ঠিক ছিল না, যুবতীর মাথাও কতটা ঠিক আছে বলা যাবে না। তবে ভিড়ের মধ্যে টেপাটেপিতে অস্থির হয়ে উঠতেই পারে। সতীত্ব বলে কথা।

তাই বলে কি এমন একটা নির্জন রাস্তায় এত রাতে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য কেউ নেমে পড়তে পারে?

মিহির আর ভাবতে পারছে না। গুলিয়ে যাচ্ছে সব। এসে পড়ছে।

আসলে তার মনেই ছিল না বাস স্ট্রাইক। এটাই লাস্ট বাস। মনেই ছিল না এত রাতে মিনিবাসও চলে না। মেয়েটি তার সতীত্বের ক্ষুরধার অচৈতন্য নির্বোধ আবেগের বশীভূত হয়ে নেমে পড়েছে।

নারী ততক্ষণে তার সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। মাথায় চটি তুলছে। সে বলছে, আরে আমি কী করলাম। আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন?

সে উঠেবে কি! তবে পায়ে চোট লেগেছে। ঘাড়েও।

সে হাঁটতে পারছিল না। সে খোঁড়াচ্ছে। মাথাটা আগের মতই ভার ভার। আর রাস্তার আলোতে পাজামা তুলে দেখছে, রক্ত বের হল কি না! নারীর মধ্যে হুঁশ ফিরে এসেছে কিনা জানে না। হুঁশ ফিরুক না ফিরুক তার কিছু আসে যায় না। চটি হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে—কি করে দেখাই যাক না।

চটি মেরে এখন তার মুখ ফর্সা করে দিলে তার কিছু আসে যায় না। কারণ কেউ দেখতে পাবে না।

হুসহাস গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার আলো মুখে এসে পড়লে গাড়ির গতি আরও বেড়ে যাচ্ছে। উটকো ঝামেলায় কে জড়াতে চায়।

সবারই তাড়া।

দুর্যোগ চলছেই। বৃষ্টির জলে ভেসে যাচ্ছে সব। ঝড়ো হাওয়ায় ডালপালা ভেঙে উড়ে যাচ্ছে।

সে দেখল, নারী শেষে কাছে এসে কেমন জলে পড়ে যাওয়ার মত তার দিকে চেয়ে আছে। যাক, বোধোদয় ঘটেছে।

সে বুঝল নারীর তবে হুঁশ ফিরেছে।

সে ল্যাংচাচ্ছে।

সে সামনের শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবল। হাওয়া বৃষ্টিপাতের হাত থেকে রক্ষ পাওয়া যাবে।

শীত করছে। হাওয়ার বেগ প্রবল। যে কোনও মুহূর্তে গাছটাছ কিংবা ডালপালা উড়ে এসে জীবন আরও বিপন্ন করে তুলতে পারে?

সে তখন দেখল, নারী তাকে অনুসরণ করছে। আসলে বাসের ভিড়ে কুণ্ডলীকৃত নারীপুরুষের মধ্যে কে কার কোথায় হাত দিয়েছে বোঝা কঠিন। তবে তার বুকে ঠেস দিয়ে যে যুবতী দাঁড়িয়েছিল, সে এ মেয়ে নয়। নয় বলাও ঠিক হবে না, কারণ বাসের ম্রিয়মান আলোতে কিছুই স্পষ্ট ছিল না। তারপর তো বাসটা অন্ধকার হয়ে গেল।

নারী তাকে এখনও অনুসরণ করছে। তবে কথা বলছে না।

মিহির বলল, হাতে চটি রেখে আর লাভ নেই। পায়ে গলান। আপনি কি পাগল!

আমি পাগল, না আপনি পাগল! লজ্জা করে না কথা বলতে! আমাকে পাগল বলছেন! বাসের মধ্যে এটা কি করলেন! আমার শাড়ি সায়া নষ্ট।

কে করল!

কী করে বুঝব, আমি কি তার মুখ দেখেছি!

সে বলল, আমি দুঃখিত। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। তারপর সোজাসুজি বলল, আমি ধৈর্য সহকারে নিজের সংযম রক্ষা করেছি।

আমার কিছুই স্খলন হয়নি।

সে জানে মেয়েটি ভিড়ের চাপে চারপাশেই পুরুষদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

সে ভাবল, বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে। নদী এবং নারী কখনও অপবিত্র হয় না। কেউ অপবিত্র করতে পারে না।

সে দেখল তখন নারী তার গা ঘেঁসে দাড়িয়ে আছে।

সে বলল, আরে করছেন কি, ছুঁলে যে জাত যাবে। কে কি করল, আর বাসে আমাকে নিয়ে পড়লেন। সরে দাঁড়ান।

নারী তাঁর কথা গ্রাহ্যই করল না।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কাতর গলায় মেয়েটি বলল, আমি এখন যাব কী করে?

সে তো আমারও চিন্তা যাব কী করে?

সে শেডের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। যদি লিফট পাওয়া যায়। গাড়ি দেখলেই দৌড়ে গিয়ে হাত তুলে দিচ্ছে।

নারী এবার যেন কেঁদে ফেলবে।

এমন নির্বান্ধব জায়গায় ভয় হবারই কথা। মিহির মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক হয়ে নিন।

শাড়ীর আঁচল কিছুটা আলগা। চুলের খোপা খুলে গেছে। তার কথায় কেমন সম্বিত ফিরে এল। সে হাতের ব্যাগটা দু হাঁটুর মাঝে চেপে, খোঁপা বাধল। আঁচল দিয়ে ভাল করে বুক ঢেকে দিল। তারপর একটা গাড়ি আসতে দেখে এগিয়ে গেল। হাত তুলে দিল। গড়িটা হুস করে বের হয়ে গেল।

মিহির ভাবল, তাড়া।

তারপর বলল, লেজে তুবড়ি বাজি জ্বলছে। বোঝলেন না। আপনি কোথায় যাবেন? তুবড়িটা বাসে না ফাটালে চলত না!

দু নম্বর গেট।

বেশি তো দূর না, হেঁটে চলে যান।

ইয়ার্কি মারছেন। জাতটাই স্বার্থপর।

সে বলল, দেখুন মানুষ পরিস্থিতির দাস। চেষ্টা করলে যতদূরেই হোক না হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবেন। কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আপনি রাস্তার কোনও ছুটন্ত গাড়ি থামাতে যাবেন না। হয়.আপনাকে পরী ভাববে, নয় খারাপ মেয়েছেলে ভাববে। কেউ গাড়ি থামিয়ে আপনাকে তুলে নেবে না।

নারী কি ভেবে বলল, বেশি দূর না। আপনি চেনেন?

চিনব না কেন! আমি তো এক নম্বর গেটে নামব বলে উঠেছিলাম। উফ পা-টা গেছে।

কোথায় লাগল! মাথায় লাগেনি তো। চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন।

সে পাজামা তুলে দেখাল। গোড়ালি মচকে গেছে। বেশ ফুলেও গেছে কিছুটা। বলল, পা-টাতেই জোর লেগেছে।

নারী ঝুঁকে দেখতে গেলে, সে পা-জামা দিয়ে পা ঢেকে দিল। তার এবার মাথাগরমের পালা।

এখন বুকের ভেতর কেমন জ্বালাবোধ করছে মিহির।

তাকে অকারণে এই মেয়েই তাড়া করেছিল—এই নির্যাতনেও সে জ্বালা বোধ করছে।

সে ভাবল; মেয়ে তুমিতো অপটু প্রত্যঙ্গ নিয়ে বাসে চলাফেরা করছ না। না তুমি বিবাহিতা। ভিড়ের বাসে কি হয় জান না!

ভিড়ের-বাসে আত্মসম্মান রক্ষা করা যে কঠিন—সরকার জানে না!

তারপরও চটি হাতে নেমে গেলে! তুমি কাকে দোষ দেবে! যে লোকটা তোমাকে অশুচি করেছে, সেও দায়ী নয়। এমন সুন্দর মেয়েটি তার সামনে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকলে তার আর দোষ কি। শরীরে তোমার সুঘ্রাণ—এমন সুযোগ কেউ হারায়।

সে দেখল, মেয়েটি তার গা-ঘেষে দাঁড়াচ্ছে।

সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, সরে দাঁড়ান। লজ্জা করছে না গা ঘেসে দাঁড়াচ্ছেন।

না সরে দাঁড়াব না। কি করবেন!

তা হলে গাল ফর্সা করে দিন। আপনারা সব পারেন।

কে তবে গায়ে হাত দিল বলুন! এতবড় একটা কু-কাজ করতেও তার বিবেকে বাঁধল না?

গায়ে হাত দিয়েছে, বেশ করেছে। কার দোষ বলুন, কে দিব্যি দিয়েছিল এই দুর্যোগে বের হতে।

কাজ না থাকলে কেউ বের হয়!

বের হয়েছেন যখন জানতেন না বাসে ভিড় হবে।

আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।

হ্যাঁ দিতে হবে। কেন আমাকে হেনস্থা করলেন বলুন?

আপনিতো সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। কি করছিলেন ভুলে গেলেন!

না ভুলিনি। এ-ভাবে ঠেলে তুলে দিলে কোনও পুরুষ পারে। আপনি কি একেবারে নিরামিষ ছিলেন? বলুন। আপনার পাশে কে দাঁড়িয়েছিল? পেছনে? আমাকে কেন ধরলেন। ইচ্ছে পূরণ হয়নি বলে, বলুন।

একদম বাজে কথা বলবেন না।

সে হেসে দিল।

ঠিক আছে। এ-ভাবে ঝগড়া না করে কি-ভাবে যাওয়া যায় চিন্তা করুন। কী শীত, কী ঠাণ্ডা। আর কি ঝড়ো হাওয়া। সবতো ভিজে গেছে।

তারপরই কি ভেবে বলল, আপনাকে ঘিরে আমরা চারজন ছিলাম। কি ঠিক, তাই কি না! সে কি ভাবল, রাস্তা দেখল, যদি কোনও গাড়ি দেখা যায়। পেছনে আপনার কেউ ছিল! তবে তাকে না ধরে আমাকে ধরলেন কেন।

জানি না।

সব জানেন। মাঝখানে আপনি। চারপাশ থেকে ঠেলা খাচ্ছেন। মাঝখানে আপনি, একেবারে অভিমন্যুর মত—আপনি রডের নাগাল পাচ্ছেন না, যেদিকে যাচ্ছেন গুঁতো খাচ্ছেন। ভিড়ের বাসে এত গা বাঁচিয়ে কেউ চলতে পারে!

সে নিজেও জানে এই নারীর দু চোখ ভারি সুন্দর, সুন্দর স্তন। ঠোঁটে হাল্কা

লিপস্টিক। কমলা রঙের শাড়ি পরনে। হাত কাটা ব্লাউজ। উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। সামনে, পেছনে, দু-পাশে যেই থাকুক প্রলুব্ধ হতেই পারে। এত ভিড়ের মধ্যে নিজেকে কতটা সামলাতে পারে। আর সে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটির সামনে—যতই তার ভিতরে কামভাব থাকুক, নারী মর্যাদা নষ্ট হতে দেয়নি। বাসে আলো ছিল না—অন্ধকার!

তার থুতনির কাছে ওর ঠোঁট। ঠোঁটে মুখে কামনা বাসনা ঝিলিক দিচ্ছিল, সে এটা স্পষ্ট টের পেয়েছে।

অথচ সে কিছু করেনি। এত সেঁটে গিয়েও সুবোধ বালকের মত কোনওরকমে শরীর আলগা রাখতে চেয়েছিল—শেষ পর্যন্ত পারেনি। নারী সবকিছু যেন সাজিয়ে দিচ্ছে, শুধু গ্রহণ করা।

এই যে মশাই ঠাণ্ডায় যে মরে যাচ্ছি। কথা বলছেন না কেন। হিঁ হিঁ করে ঠাণ্ডায় কাঁপছেন।

বাসের দৃশ্যগুলো বার বার মাথায় ফিরে আসছে। এই চিন্তাও ঠাণ্ডা নিবারণ করতে পারে—নারী ঠেলা খেয়ে কোমর বাঁকিয়ে দিয়েছে, পা রাখার পর্যন্ত জায়গা নেই—তার কোমরও বেঁকে গেছে। এবং নগ্ন স্ত্রী-পুরুষের মত মৈথুনের দৃশ্যের মত তারা বেশ আসছিল—তার ভাল লাগছিল এবং শরীরও গরম হয়ে গেছিল, অথচ সে জানে নারীর কোনও শ্লীলতাহানি করেনি। কারণ সে গায়ে হাত দেয়নি। ইতর যে অর্থে বলা হয়ে থাকে তেমন কোনও কাজ করেনি। সে...

অন্ধকারে সেও ভাল ছিল না।

মেয়েটি বলল, কি কথা বলছেন না কেন। এ-ভাবে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা যায়!

মিহির বলল, দেখুন না কোনও গাড়ি থামাতে পারেন কি না! ফিরবেন কি করে! আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

সঙ্গে কেন, যান না। আমাকে দেখলে নাও নিতে পারে। আপনি একা থাকলে অবলা নারী ভেবে তুলেও নিতে পারে। যেখানে নামতে চান নামিয়েও দিতে পারে।

নারী দাঁড়িয়েই আছে। ব্যাগের চেন খুলে কি দেখছে।

সে ভাবল কিছুটা হেঁটে গিয়ে কোথাও বসা দরকার। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে সব ভিজে গেছে। কখনও অঝোরে—কখনও ঝির ঝিরে—আচ্ছা বৃষ্টির নমুনা।

উঁচু মত জায়গা পেলে ভাল হয়। সে হাঁটা দেবার সময় শুনতে পেল, আমাকে একা ফেলে কোথায় যাচ্ছেন!

সে বলল, সামনে। ওদিকের শেডে রেলিং আছে। গাড়ি থামাতে বলবেন? থামলে তুলে নেবেন। দাঁড়াতে পারছি না।

দেখি পা-টা!

না।

কারণ তার ইচ্ছে হচ্ছিল একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পর মারতে। না হয় ধর্ষণ করতে। কিন্তু এই মুহূর্তে পায়ের ব্যথায় সে হাঁটতেই পারছে না। মেয়েটি এসে হাত ধরে বলল, আসুন। হাত ধরে রাস্তা পার করে দিচ্ছি, দেখি কোনও গাড়ি থামাতে পারি কি না। আমাকে একা ফেলে কোথাও কিন্তু চলে যাবেন না। তা হলে আমি সত্যি একা হয়ে যাব। তখনই সে নারীর মুখে দেখল সুহাসিনীর সেই স্নিগ্ধ চাউনি। তার সব ক্ষোভ জল হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে কেন যে তার মনে হল, লাভ ইজ কাইন্ড, লাভ ইজ গড। লাভ ইজ সুহাসিনী।

তেরো

মিহির ফের চোখ তুলে দেখল, সেই ছাতা মাথায় লোকটা আসছে কি না। কিন্তু এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যেন প্রলয় শুরু হয়ে গেছে।

এই প্রলয়ে ছাতা মাথায় কেউ হেঁটে কখনওই আসতে পারে না। ছাতা ওল্টে কিংবা না ওল্টালে, সবসুদ্ধ খড়কুটার মতো উড়ে যাবে। আসলে কোনও ঘোর থেকেও দেখতে পারে। অথচ মিহির যে আশায় ছিল ছত্রধারী কাছে এলে বলবে, এই শুনছেন!

কি!

এই নাবালিকাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যান। আমি হাঁটতে পারছি না।

কিন্তু কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না, না ছাতা, না ছত্রধারী।

আর তখনই ঝর্ণা বলল, আপনি কি আত্মহত্যা করতে বের হয়েছেন!

আমি না আপনি! আপনি বাস থেকে চটি হাতে যে লাফিয়ে পড়লেন, জানতেন না এটা লাস্ট বাস। ইজ্জত, এখন বুঝোন ইজ্জত কারে কয়।

এবং কেন যেন সহসা মিহির ক্ষোভে ফেটে পড়ল। একেবারে নাবালিকা! আরে বাসের ঠেলা সহ্য করতে না পারলে বাসে ওঠা কেন!

ঝর্ণা বিবাহিতা না অবিবাহিতা তাই তো বুঝতে পারছে না। ঝড় বৃষ্টিতে যদি সিঁথির সিঁদুর ধুয়ে মুছে যায়, ধুয়ে যেতেই পারে, আবার ধুয়ে নাও যেতে পারে—এত হালকা সিঁদুর পরার চল যে, সেটা থাকলেও হয় না থাকলেও হয়। মাকু পার্টি করলে তো হয়েই গেল। শাখা সিঁদুরের ক্যাঁথায় আগুন দিয়ে

একেবারে যুবতী পরম রূপবতী হয়ে থাকা যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীদের এই এক বিদ্রোহও শুরু হয়ে গেছে। মেয়েটার কপালে সিঁদুর হাতে শাঁখা আছে কি নেই, ভেবে লাভ নেই।

বিয়ে হলে তো থোতা মুখ কবেই ভোতা হয়ে গেছে। তার আবার এত ইজ্জতের বাড়াবাড়ি কেন! মিহির নিজের মনেই বিড় বিড় করছে। প্রলয় থেকে আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টাই করছে না। শেডের নীচে এতক্ষণ এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। ঝড়ো হাওয়ায় মেয়েটির শাড়ি-সায়া মাথার উপর উঠে যাচ্ছে—মিহির এ-সব দেখতে রাজি না। সে সেই ছত্রধারীর অপেক্ষায় আছে। তা হলে তারা তিনজন একসঙ্গে হাঁটতে পারবে। পাশের নারী আর কখনও ধূমাবতী হয়ে তাড়া করতে পারবে না। এরা যে কখন কালনাগিনী আর কখন সুহাসিনী বোঝা কঠিন।

ছত্রধারী যেই হোক, ঘোর থেকে সৃষ্টি হলেও ছত্রধারী একজন সহযাত্রী তাদের, অথবা প্রলয়ের যা অবস্থা, সে এখনও বুঝতে পারছে না, কতটা হেঁটে যেতে পারবে, ছত্রধারী সঙ্গে থাকলে তার অন্তত সাহস বাড়বে। সে আবার রেলিঙের উপর ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল। পথে নারী বিবর্জিতা কথাটাও মনে হল তার।

কোথায় ছত্রধারী!

এই ঝাপসা অবিরল ধারাপাতের মধ্যে দেখা গেল একটি ছাতা শুধু উড়ে উড়ে আসছে। বৃষ্টিতে কখনও লাট খাচ্ছে, আবার কখনও লাফিয়ে লাফিয়ে এই প্রলয়ের মধ্যে রাস্তায় তামাশা দেখাচ্ছে।

কারণ তখন এই ভি আই পি রোড ঝড়ে প্রলয়ে এত নির্জন, এবং গভীর রাত বলে, তামাশা দেখাবার সেই একমাত্র সাথী, তা হলে শেষ পর্যন্ত লোকটাও হাপিজ হয়ে গেল।

কী দেখছেন!

ঝর্ণা যেন একেবারে তাকে জড়িয়ে ধরছে। ভয়ে আতঙ্কে জড়িয়ে ধরতেই পারে।

দুরে একটা আলোর তরঙ্গ ভেসে উঠছে।

আসছে, আসছে। আবার যান, দেখুন গাড়িটা থামাতে পারেন কি না। আপনি অবলা, দেখলে তুলে নিতে পারে।

সে যাই হোক, যদি ছত্রপতি বাগুইহাটি হয়ে যায়। জ্যাংরার দিকেও যেতে পারে—খুবই ভাল হয় তবে। মিহির তো জ্যাংরাতেই থাকে। নন্দ এখনও জেগে আছে। দাদাবাবু ঠিক এই প্রলয়ে আটকে গেছে—আসলে এক নম্বর গেটে

সে নামছে না, মেয়েটির নামার কথা দু'নম্বর গেটে? আসলে কেউই সত্য কথা বলছে না। আরে কি হচ্ছে! সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। বাসে তো নেই যে জাপ্টে ধরে রাখতে হবে! সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। আমিতো দেখছি—

কি দেখছেন!

দেখছি একটা ছাতা প্রলয়ের মধ্যে নাচছে।

আপনার মাথা খারাপ।

মাথা খারাপ আমার না, আপনার।

আমি তো হাঁটতে পারছি না। ছত্রপতি এলে তার সঙ্গে যেতে পারতেন।

আমি আপনাকে ফেলে কোথাও যাব না।

কেন!

কেন আবার কি! গেলে একাই চলে যাব। আমার কোনও ছত্রধরকে দরকার হবে না।

যান না তবে।

আপনি একা হয়ে যাবেন না।

যাই তো, আপনার কি!

আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেতে পারে। আমার লোপ পায়নি। পায়ে জোর পাচ্ছেন!

পাচ্ছি।

আবার মিছে কথা বলছেন!

কে মিছে কথা বলছে না বলুন তো! কারও দিকে আঙ্গুল তুলে বলুনতো লোকটা মিছে কথা বলে না। দেখান আমাকে, একটা লোক অন্তত যে মিছে কথা বলে না।

কেন আমাদের সব মহাপুরুষরা?

ওরাই তো সব চেয়ে বেশি মিছে কথা বলে গেছে। অজস্র মিছে কথা বলে ধর্ম বানিয়ে গেছে। আপনার ইজ্জত সম্ভ্রম তৈরি করে গেছে। কিন্তু আমরা কি এই সম্ভ্রম স্বামী স্ত্রী হয়ে ধুলোবালিতে মিশিয়ে দিই না।

না পারা যাচ্ছে না!

কি পারা যাচ্ছে না।

জানি না যান। এখানে পড়ে থাকলে চলবে!

আমার চলবে। আপনার চলবে না।

কারণ মিহির জানে তার কাছে এমন দামি কিছু নেই যা ছিনতাই হতে

পারে। কিন্তু যুবতীর গলায় পাতলা চেন হার আছে, হাতে বালা আছে। তবে গিল্টিনর কি না জানে না। আর যদি তা না হয় তবে আর এক হুজ্জতি।

তারপরই কেন যে মনে হল, সেতো পুরুষমানুষ একজন অবলা নারীকে বিপদে ফেলে সে সরে পড়তে পারে না। তা ছাড়া পায়ে চোট। এমন প্রলয়ে তার নিজের পক্ষেই আত্মরক্ষা করা কঠিন। ঝড়ে গাছ পড়ছে, ডাল ভাঙছে—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অহরহ, আর ঠাণ্ডা জলো বাতাসে সে শীতে কাঁপছে। সেখানে ছাতা মাথায় লোকটা যদি অসময়ে যুবতীকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

সে এ-সব ভাববার সময়ই দেখল, যুবতী দৌড়ে গিয়ে একটা গাড়ি ঠিক থামিয়েছে। একটু দূরে। মিহির দৌড়ে যেতে পারছে না। গাড়ির দরজা খুলে দিচ্ছে কেউ। নারী তাকে ইশারায় ডাকছে। সে গেলে উঠবে।

মিহির এখন কি করবে বুঝতে পারছে না।

মাথার অস্বস্তি কিছুতেই কমছে না। পড়ে গিয়ে মাথার পেছনের দিকটায় সে খুব চোট পেয়েছে। পাটা ভালই মচকেছে। হাত দিয়ে দেখল, গোড়ালি কিছুটা ফুলেও গেছে।

পায়ের চোটের জন্য সে আদৌ চিন্তিত নয়। পায়ের এই চোট তার আগেও ছিল। স্যু পরে হাঁটাহাঁটি করলে, এবং কখনও বেকায়দায় পড়ে টড়ে গেলে বা পাটা কিছুটা মচকে যেত। বছরে দু-একবার সে এই অভিজ্ঞতায় জানে, কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলে, সে দরকারে হেঁটেও ড্যাংরার বাসায় চলে যেতে পারবে। কষ্ট হবে, তবে এই চোট পাওয়া তার ধাতে আছে।

মাথার অস্বস্তিটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে জানে না। অকারণে এই তাড়া খাওয়ায় সে আবার ভিতরে ভিতরে ক্ষেপে উঠছে।

যুবতী তখনও ইশারায় ডাকছে।

যেন সে গেলে দু'জনেই গাড়িতে উঠে পড়বে।

দরজা যখন খুলেছে, তাদের তুলে নেবেই। সে দ্রুত হাঁটতে গিয়ে বুঝল না পারবে না, তাকে খোঁড়াতে হবেই। আর তখনই দেখল দরজা বন্ধ হয়ে গেছে গাড়ির। হুঁস করে গাড়ি চলে গেল।

সে শুধু একটা কথাই বলল, যাঃ—

নারী সে-ভাবেই একা দাঁড়িয়ে আছে। মিহির ঠিক বুঝতে পারল না দরজা খুলে দিলেই বা কেন, আবার দরজা বন্ধই বা করে দিল কেন।

মিহির তাড়াতাড়ি ফের শেডের তলায় ঢুকে সিগারেটের এবং লাইটারের খোঁজ করল। একটি শৌখিন মিনা করা বাকসে সিগারেট এবং লাইটারের ব্যবস্থা আছে। সিগারেট টানলে যদি মাথার অস্বস্তিটা কমে। এতটা দীর্ঘ সময় সিগারেট

না খাওয়ার জন্যও মাথায় বোধ হয় গণ্ডগোল বেড়ে গেছে। হাওয়া বৃষ্টি আড়াল করে সে দ্রুত সিগারেট ধরাবার সময় দেখল নারী রাস্তা অতিক্রম করে এঁদিকেই আসছে। এই যুবতীর কোনও নাম আছে তাও সে ভুলে গেছে।

মেয়েটাই বা গাড়িতে উঠল না কেন! বিষয়টা কিছু রহস্য সৃষ্টি করতেই মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, না, হল না।

অনেক কসরত করে হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরাল ঠিক তবে টেনে সুখ পেল না, মাথার অস্বস্তি বিন্দুমাত্র কমছে না।

কেন হল না? মিহির না বলে পারল না।

হল না।

দু-হাত বাড়িয়ে অদ্ভুত স্রাগ করে মেয়েটি কথাটা ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

তার মেজাজ খাপ্পা। ভেবেছে কি! মানুষের ধর্ম বলে কি কিছু নেই! এই ছিন্নমস্তা, এই চামুণ্ডা আর এই বনদুর্গা। যেন এই নির্জন পথমধ্যে পড়ে গিয়ে একজন বোকা লোকের সঙ্গে বেশ মজা করার গাড়িতে উঠে বসলেই মজা শেষ। দজ্জাল মেয়েটা আসলে ইচ্ছে করেই গেল না।

সুযোগ হাতছাড়া হলে কার না মেজাজ খারাপ হয়। সে যে কী করে! হাঁটতে গেলেই গোড়ালি তাকে বিপাকে ফেলে দিচ্ছে। তাকে এখন রুগ্ন লোকই বলা যায়। মেয়েটা ইচ্ছে করেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যও হতে পারে।

তারপরই কেন যে মনে হল তার, মেয়েটির মাথায় কি গোলমাল আছে! নারী তো ঘোরে পড়ে গিয়ে বাসে ভেবেছিল তাকে নিয়ে ময়দা মাখামাখি চলছে। সব দিক থেকে ময়দা মাখামাখি চলতে থাকলে মাথা ঠিক রাখা কতদূর সম্ভব সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে এমন দুর্যোগের রাতে গাড়ি ছেড়ে দেবার অর্থ কি!

সে খেপেই গেল।

আরে বলবেন তো কেন হল না! কি বলল!

আমাকে একা নিতে রাজি।

একা মানে!

একা মানে একা। যেই বললাম শেডে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, খোঁড়া, হাটতে পারছে না, পঙ্গু, একটু যদি তুলে নেন—পড়ে গিয়ে আবার মাথায় চোট পেয়েছে—ব্যস।

কি বলল!

কিছু বলল না। গাড়ি স্টার্ট দিতেই ভাবলাম, তা হলে তুলে নিচ্ছে, ও

মা দেখি, গাড়িটা ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গেল।

সে যথেষ্ট বিরক্ত। আরে একা না গিয়ে আমাকে পঙ্গু সাজিয়ে এত ভালমানুষি করার কি দরকারটা ছিল! এমন বলার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু মেয়েটির কি করুণ কথাবার্তা। দুজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে আমি যেতে পারি! .কেউ পারে? কোনও মেয়ে!

শুনুন!

সে এবার সত্যি যেন জুতো মেরে মেয়েটার গাল সাফ করতে যাচ্ছে।

আমি পঙ্গু কে বলেছে আপনাকে?

পঙ্গু না হলে কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। কী হাওয়া!

সে বলল, সব জলে ভিজে গেছে। কী ঠাণ্ডা বলুন! প্রলয় তো কমছে না।

কমবে না। নিজেও মরলেন আমাকেও মারলেন। এখন একটা আস্তানা খুঁজে না পেলে ঠাণ্ডায় এই রাস্তায় দু'জনেই পড়ে মরে থাকব। বুঝতে পারছেন। কানে কথাটা যাচ্ছে।

যাচ্ছে তো, ত আমি কি করব?

দেখুন আমি পুরুষমানুষ। একা রাস্তায় পড়ে থাকলেও কিছু যায় আসে না।

সিগারেটে আপনার কি আগুন নিভে গেছে!

যা বলছি শুনুন। আমার সিগারেট নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। নিজেকে নিয়ে ভাবুন, একা শেডে পড়ে থাকলেও কিছু যাবে আসবে না। গাছের নীচে বসে থাকলে কিংবা কোনও বারান্দায় পড়ে থাকলে মাথা খারাপ ভাবতে পারে।

মেয়েটি এবার তেড়ে ফুঁড়ে বলল, আপনার কি হয়েছে বলুনতো।

আমার কিছু হয়নি।

আমারও হয়নি।

তবে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছেন কেন।

আপনার লেকচার আমি শুনতে চাই না। আপনি লেকচার থামান।

না লেকচার থামাব না। না থামালে আপনি কি করতে পারেন! একা এই প্রলয়ে হেঁটে যেতে দেখলে চোর ছ্যাঁচোড়, ছিনতাইবাজ ভাবতে পারে। পুলিশ খুব বেশি হলে থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারে। এর বেশি কিছু হতে পারে না। কিন্তু এ-ভাবে রাস্তায় দুর্যোগের রাতে কুকুরের মতো ঘোরাঘুরি করলে, আপনার শ্লীলতাহানির ভয় আছে জানেন! কোথা থেকে কে খবর পেয়ে যাবে,

গন্ধে গন্ধে এসে যায়। আপনার পাশে জুটবে। এটা কি ভাল হল! গাড়িতে একা চলে গেলে অন্তত নিজে বেঁচে যেতেন।

ধুস এক কথা বার বার ভাল লাগে না।

ছত্রধর গেল কোথায়!

সে কোথায় গেল আপনি বুঝুন। আপনি দেখেছেন, আমি কোনও ছত্রধরকে দেখিনি। আচ্ছা আপনার নাম কি?

আমার নাম দিয়ে কি হবে? আপনার নামটা বলুন?

কতবার বলব।

বলেছেন! হবে। মাথাটা গোলমাল করছে।

আমার নাম জানার এত আগ্রহ কেন আপনার?

যদি ছিনতাই হয়। যদি বাজে লোক এসে আপনাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। নিতেই পারে। হাতে ওগুলো গিল্টির না সত্যিকারের অলঙ্কার!

কি হবে জেনে!

পুলিশের ঝামেলায় পড়লে জানতে চাইবে না, জ্যাংরায় থাকে জানেন, কী নাম জানেন না?

গিল্টির না সোনার জেনে কি হবে। ধরে নিন গিল্টির, ধরে নিন সোনার।

সে বুঝল মেয়েটিকে এ-ধরনের প্রশ্ন করা উচিত হয়নি। সেও তো মেয়েটির সর্বনাশ করতে পারে।

লোভ মানুষকে মুহূর্তে পিশাচ করে তুলতে পারে। অমানুষ করে তুলতে পারে।

প্রবল বৃষ্টিতে সায়া শাড়ি ব্লাউজ সব গায়ে এত সেঁটে গেছে যে নারীর সম্পূর্ণ অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তারপরই মনে হল এমন নির্জন রাস্তায় প্রায় ঝিলের ধারেই বলা যায়, দূরের ঘরবাড়ির কোন আলোই আর দৃশ্যমান নয়, দূরের শুধু নয়, কাছেরও, ইতস্তত দু একটা গাড়ি, ট্রাক এবং যাবতীয় যানবাহন রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, তবে তারা শেডের তলায়, এবং জায়গাটা গাছপালার ছায়ায় কিছুটা অন্ধকারও হয়ে আছে—সে ইচ্ছে করলে হাত টেনে জঙ্গলে ঢুকিয়ে নিতে পারে—অথচ সে কিছুই পারছে না। ধুর যত সব বাজে চিন্তা, কোথাকার কে তার ভারি বয়ে গেছে।

মাথার ভিতর বেশ অস্বস্তি।

সে মাথা ঝাঁকাল।

আর তখনই সে দেখল ছাতা মাথায় কেউ সত্যি এগিয়ে আসছে।

মেয়েটা আতঙ্কে তার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতই একটি ছাতা তা হলে হাওয়ায় ভেসে আসছে। ভূতুড়ে বিষয় হতে পারে। ছাতার নীচে কে আছে কে জানে! কী যে উটকো ঝামেলায় পড়া গেল।

তখনই মেয়েটি বলল, শীত করছে না আপনার। কী কথা বলছেন না কেন? আমার নাম ঝর্ণা। ঝর্ণা। ঝর্ণা—এবার মনে থাকবে তো?

সে সাড়া দিল না।

ঝর্ণা কি শরীরের ওম চায়। একেবারে শরীরের সর্বস্ব দিয়ে আলিঙ্গনের মতো।

সরে দাঁড়ান।

কেন।

কেন আবার। লজ্জা করে না, দেখছেন বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দে ছাতাটা কেমন নাচছে। পাক খাচ্ছে—উড়ছে। ভেতর থেকে কে বের হয়ে আসবে এবার দেখুন।

না আর পারছি না। একটা আস্তানা খুঁজে না পেলে মরে যাব ঠাণ্ডায়।

ঝর্ণা বলল, সেই কখন থেকে ছাতাটা অন্ধকারে উড়ে আসছে। ছাতা না অন্য কিছু। এত অন্ধকারে কিছুই তো দেখা যায় না। ঝড়ের শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

রাস্তার বাতি জ্বলছে। অন্ধকার কোথায়!

ঝর্ণাও ভাবল, রাস্তার আলো জ্বলছে বলেই চারপাশের অন্ধকার আরও প্রকট।

ঝর্ণা বলল, সামনে এগিয়ে গেলে হয় না। জায়গাটা কোথায়, শেষে কোথায় এসে গেলাম কিছুই বুঝতে পারছি না। এটা কি দমদম পার্কের আগের স্টপ!

আজ্ঞে। তাইতো মনে হয়।

গাড়ির দরজা খুলে গেল বন্ধ হয়ে গেল, আপনাকে না নিয়ে চলে গেল—বিড় বিড় করে বকছে লোকটা। শীতে কাঁপছে। দুজনে জড়াজড়ি করে থাকলে শীত কম লাগে। কিন্তু এই মানুষটা কি বোধবুদ্ধি সব হারিয়েছে।

হারাতেই পারে।

মাথায় চোট, পায়ে চোট, এখন যদি মানুষটার শরীর শিথিল হয়ে যায়, যদি ঠাণ্ডায় ধপাস করে মরে যায়—কী দেখছেন?

ছাতা।

ছাতা ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

না।

আপনি ছাতা দেখুন, আমি রাস্তা খুঁজি।

রাস্তা খোঁজা কি সহজ! আসল রাস্তা কোনটা কেউ জানে!

এই প্রলয়ের মধ্যে দার্শনিক কথাবার্তা কার ভাল লাগে! আর পারছি না। ঝর্ণা বলল।

কি পারছেন না বলতে পারত সে। শরীর কি গরম হয়ে যাচ্ছে। দুজন নারীপুরুষ একসঙ্গে কোনও জনহীন প্রান্তরে ঢুকে গেলে, শরীরে উত্তেজনা জন্মাতেই পারে।

কোথাও চলুন। ঝম ঝম করে প্রবল বৃষ্টি—এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! বলে ঝর্ণা তার কপালের চুল সরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। মুখে প্রকৃতই যথেষ্ট দুর্ভাবনার ছাপ। অথচ তেজ এতটুকু কমছে না।

এ-যে পাগলের পাল্লায় পড়ে গেলাম। আরে ছাতা কোথায়? কোথায় ছাতা বলুন। ছাতা দিয়ে কি হবে। বিপন্নতা যে অশেষ বুঝতে পারছেন না। ঝর্ণা প্রায় কেঁদেই ফেলবে যেন। কী যে পাগলের পাল্লায় পড়া গেল!

পাগল, পাগল সঙ্গে না থাকলে বুঝতে ঠ্যালা। কারণ সে এক নম্বর গেটে যাবে, না আরও আগে তার সেই বাগানবাড়িতে ঢোকার রাস্তা পেয়ে যাবে, সে তো তার বাসাবাড়ির কথা ঘুণাক্ষরেও জানায় নি, দেড় কিলোমিটার সে হেঁটেই চলে যেতে পারত, কিন্তু যেতে পারছে না। একটা পা ক্রমে যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

মাথার ভিতর অস্বস্তি বরফের মতো শীতল—শিরদাঁড়া বেয়ে কষ্টটা গোড়ালিতে নেমে যাচ্ছে। তবে রাস্তাঘাট সর্বত্রই বিপজ্জনক—দিনের বেলাতেই কত কাণ্ড ঘটছে, আর এটা তো দুর্যোগের রাত।

সবচেয়ে বিভীষিকা তেঘরিয়া নারায়ণপুরের দিকটায়। শুধু বন জঙ্গল, চাষবাসের জমি, গরিব গেরস্থবাড়ি কোথাও, একেবারে দিকশূন্য মাঠ। জলা জঙ্গলে ভর্তি। মানুষ খুন করে দুবৃত্তরা ওদিকেই ফেলে রেখে যায়। চিল শকুন না উড়লে বোঝাই যায় না, ওখানে কোনও খুন খারাবির লাস পড়ে আছে। শুধু এয়ারপোর্টের আলো ছাড়া দুর্যোগের রাতে আর সব কিছু দৃশ্যমান্যতা শূন্য।

কিন্তু সে জানে ঝর্ণা তাকে তাড়া করে নিয়ে এল শেডে, কেমন এক বিভীষিকাময় জায়গায়। বাঙ্গুরের রাস্তাটা যদি খুঁজে পাওয়া যায়। তবে রাস্তা পার হলে খাল, তারপর সল্টলেক নামক এক উপনগরীর পত্তন হচ্ছে—ঢাউস সব পাইপ না হয়, বেনাগাছের জঙ্গল, আর কাশবন—রাস্তা পার না হয়ে বা-দিকে ঢুকে গেলেই বেশি নিরাপদ।

খুন জখম রাহাজানির খবরে কাগজের পাতা ভর্তি থাকে। ধর্ষণের খবরও থাকে। দরজা খুললেই সাপ ফোঁস করে উঠতে পারে। সাপেরা সর্বত্র নিশাচর হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাবলিকের এই এক আতঙ্ক। দরজা খুলে দিতে যাবে কেন। গেলেই কেউ দরজা খুলে আশ্রয় দেবে ভাবাও বাতুলতা। নিশাচর প্রাণীরা বাদুরের মতো ওড়াউড়ি করে। মানুষের দোষ দিয়ে লাভ কি।

সে বলল, আর হাঁটতে পারছি না। এখানেই বসে পড়লাম।

কী করছেন?

আমি বললাম, আর হাঁটতে পারছিনা।

এখানটায় কিছু কাঞ্চনফুলের গাছ আছে। একটা শনির থানও আছে। ভি আই পি ধরে শনি ঠাকুরের ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে কবে।

টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা। দুর্যোগ কি কমে আসছে। ইতস্তত কাঞ্চনফুলের সাদা পাপড়ি উড়ছে। শনির থানে সাদা কাঞ্চনফুলের পাপড়ি, ভাবা যায় না।

ঝর্ণা বলল, কী বকছেন! কিছু বুঝতে পারছি না।

বলছি কাঞ্চনফুলের সাদা পাপড়ি শনির থানে। নির্জন এই ঘোর নীশিথে শনিঠাকুর?

এটা শনির থান!

আজ্ঞে।

ঝর্ণা একেবারে উপুড় হয়ে পড়ল।

আপনি উঠবেন না, বসে থাকবেন।

যাবটা কোথায়!

একটু নেমে দেখলে হত না।

ভি আই পি ছেড়ে কি যাওয়া ঠিক হবে! গাড়ি টারি যদি পাওয়া যায়।

কিছুই তো নেই!

ঝর্ণা হাত টেনে বলল, উঠুন। আমি ধরছি। আমি আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। বৃষ্টি কমে গেছে।

সে কোনও কথা বলছে না। কথা বলতে তার ভাল লাগছে না!

কী হল! রাস্তায় পড়ে থেকে কী করতে চান।

ছাতা মাথায় লোকটাতো এগিয়ে আসছে।

আবার ছাতা? ঝর্ণা না বলে পারল না।

আবার ছাতা নয় কেন? সে না বলে পারল না।

আপনার চোখের দোষ।

ঐ তো আসছে। জিজ্ঞেস করুন ছত্রধারীকে—দোষ আমার না আপনার!

আরে কোথায়—ঐ যে আসছে, বললেই হল! উঠুন বলছি। ঝর্ণা জোর করতে থাকল।

উঠতে বলছেন।

হ্যাঁ বলছি। ঝর্ণা বলল।

জীবন যে দিকশূন্য হয়ে গেল!

হবে না! বলুন! উঠুন।

উঠতে বলছেন।

আজ্ঞে।

আচ্ছা মেয়েরা তো আজকাল সব যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে আছে!

আপনি তো আচ্ছা ত্যাঁদড়।

তা হবে। ছাতাগুলো......।

ছাতাগুলো হয়ে গেল! একজনকে দিয়ে পোষাল না?

হ্যাঁ অজস্র ছাতা সাদা নীল হলুদ পিংক কালারের বুড়বুড়ি কাটছে হাওয়ায়। চারপাশে তারা উড়ছে।

ছিল একটা ছাতা। এখন দেখছি আপনার চোখে অনেক রঙবেরঙের ছাতা। ওগুলো ছাতা নয় মশাই! ঝর্ণার ঠোঁটে বিদ্রূপ।

কী তবে!

সর্ষেফুল। আপনি সর্ষেফুল দেখছেন চোখে। হাত ধরুন। ঝর্ণা সোজা বলে দিল।

তার যেন প্রকৃতই হুঁস ফিরে এল।

হুঁস ফিরে আসতেই অজস্র সর্ষেফুল চোখ থেকে সরে গেল। শনির থান পার হয়ে নীচের আধ কাঁচাপাকা সড়কে ঝর্ণার হাত ধরে নামতে থাকল।

কয়েক পা নেমেই সে হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে আবার ভি আই পিতে উঠে যেতে থাকল।

আরে করছেন কি! ঝর্ণা ছুটছে।

কিছু করছি না। বড় রাস্তায় থাকলে কিছু না কিছু পেয়ে যাব। প্রবল হাওয়ায় মেঘ উড়িয়ে নিচ্ছে। শালা মেঘেরও আর শেষ নেই। তবে আপনি মেয়েছেলে, আপনার জোরের তুলনা নেই।

ঐতো যাচ্ছে। গাড়ি, হেডলাইট, ওহো কি মজা!

ঝর্ণা বলল, আপনার মজা বের করছি। ঝর্ণাও ছুটতে থাকল।

সে তখন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল।

আসছে আসছে। গাড়িটাকে থামাতেই হবে। সে নাকি সর্ষেফুল দেখছে!

দ্যাখ কে সর্ষেফুল দেখে!

আরে করছেন কি!

সে বলল, কিছু করছি না। গাড়িটাকে থামাতেই হবে।

ঘ্যাচ করে গাড়িটা থামতে পারত—কিন্তু আশ্চর্য বল ড্রিবলিং করার মতো পাশ কাটিয়ে সাঁ করে বের হয়ে গেল।

তার মুখ থেকে বের হয়ে এল—শা শা লা। আর একটু হলেই সে চাপা পড়ত।

চোদ্দ

আপনি আমার কাঁধে হাত রাখুন। এবারে হাঁটুন।

সে নাবালকের মতো ঝর্ণাকে অবলম্বন করে হাঁটছে।

ঝর্ণা কাছে না থাকলে গাড়িটা হয় তো তাকে চাপা দিয়েই চলে যেত। আজকাল সাধু ফকির বলে কিছু নেই— নির্বিশেষে সবাই চোর। কম বেশি। যেখানেই হাত দিন না কেন, সরকার থেকে পাবলিক, সুযোগ পেলেই খুন রাহাজানি। নিতান্ত ভদ্রলোক, যাকে বলে সুনাগরিক তারাও বাদ যায় না। কারণ তারা সহ্য করে।

এদিকটাতেও দু-পাশে খাল, বৃষ্টির জলে ভরে গেছে। রাস্তায় কোমর জল।

ঝর্ণা এ-কোথায় নিয়ে এল!

তার নাটক করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

এ-কোথায় নিয়ে এলে সুন্দরী! অবশ্য সবই মনে মনে। সেই বলেছিল, আর একটু এগোলে একটা মালটিপারপাস স্কুল মিলে যেতে পারে।

ঝর্ণা বলল, স্কুলে যদি জল ঢুকে গিয়ে থাকে।

স্কুলটা উঁচু জায়গায়। ঢুকবে বলে মনে হয় না।

ভাগ্যিস ঝর্ণা গাছের নীচ থেকে ছুটে এসেছিল!

আপনি কি মরবেন!

মরব কেন!

মরার ইচ্ছা না থাকলে কেউ এ-ভাবে মাঝ-রাস্তায় গাড়ি থামাতে দাঁড়িয়ে যায়! আচ্ছা আপনার কী ইচ্ছে বলুন তো—ঝর্ণা এমন হয়তো বলেছিল। ঝর্ণাকে দেখেই গাড়িটা যে ড্রিবলিং করে পাশ দিয়ে চলে গেছে—যা রাস্তা আর যা বৃষ্টি, অত জোরে ব্রেক কসলে গাড়ি উলটে যেতেই পারত। নিজেদের

আত্মরক্ষার্থেই গাড়ি তাকে বাঁচিয়ে গেল। তারাও বেঁচে গেল।

প্রবল বৃষ্টি। কোমর জল। দু'জনই খুব সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে। দু'একটা কথা—এবং একে অপরকে দোষারোপ করা। এই যে দুর্যোগের রাতে তারা একটু ডাঙ্গার খোঁজে উঠে যাচ্ছে—তার একমাত্র কারণ এই নারী।

মিহির সেই দৃশ্য ভাবলেই ক্ষেপে যাচ্ছে। আবার মাঝরাস্তায় যে গাড়ি চাপা পড়েনি, তাও ঝর্ণা ছুটে এসেছিল বলে, তারপর ক্ষ্যাদামারা অবস্থায় সে না বলে পারল না, আপনি আমাকে বাস থেকে নেমে তাড়া করলেন কেন বলুন!

এক কথা কাহাতক ভাল লাগে—বলেছি তো ভুল হয়ে গেছে।

ভুল হয়ে গেছে! সে মুখ ভেংচে উঠল। তারপর বলল, ভুলের মাশুল কে দেবে? বলুন কে দেবে? বাড়িতে আপনার দুঃশ্চিন্তা করবে না! আপনার বাড়ির লোকদের কী এখন অবস্থা ভেবে দেখেছেন! আপনি ফিরছেন না, তারা ঘরবাড় করছে। থানায় খবর দিতে পারে। কী, বলুন দিতে পারে কি না!

না পারে না।

বাড়িতে আপনার কেউ নেই?

আছে।

কে আছে?

কেন আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন না!

আপনাকে দেখার সময় পেলাম কোথায়! ওষ্ঠাগত প্রাণ। তার কি নারীর শরীর দেখার ইচ্ছে হয় বলুন!

যাক গে— বিবাহিতা রমণী। সেই থেকে এই একটা কঠিন বিষয় নিয়ে সে ভেবে যাচ্ছে। মেয়েটি বিবাহিতা না কুমারী! কুমারী নয় যখন, তার এত শুচিবাই থাকারও কথা না। পরিবহণ ব্যবস্থা যে বেহাল মিহিরতো কাগজের লোক বলেই সব জানে।

সে বাসে এতটা খেয়াল করেনি। কোঁকড়ানো চুল, এবং সিঁথির অভ্যন্তরে গোপন সিঁদুরের রেখা থাকলেও থাকতে পারে। হাতে নোয়া নেই, শাঁখা নেই। ভেবেই ফেলেছিল না, কিছুতেই বিবাহিতা হতে পারে না। বিবাহিতা না হলে তার বোধহয় কিছুটা সুবিধা হয়। সে কাঁধে হাত রেখে, 'অন্ধজনে দেহ আলোর' মতো করে হাঁটছে। কোমর জলের এই রাস্তা পার হলেই ডাঙ্গা পেয়ে যাবে। তখনই মনে হল সেই ছত্রধরকে আবার দেখা যাচ্ছে। সামনে সেও হাঁটছে।

আরে এত ঝুঁকে কি দেখছেন!

সেই ছত্রধর।

আপনার মুন্ডু, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঠেলে ফেলে দেব বললাম। আপনি আবার সর্ষেফুল দেখছেন!

আপনি তাহলে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

আজ্ঞে না।

কিন্তু সে যে আসছে।

আসুক। আসতে দিন।

এত দেরি হয়। কখন থেকে এগিয়ে আসছে। অথচ আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। আমি সর্ষেফুল দেখছি। আসলে আপনি সর্ষেফুল দেখছেন। অথচ মনে হয় আমরা সবাই একই সঙ্গে হাঁটছি।

ঝর্ণা তার কোনও কথাই শুনতে চাইছে না। আবছা মতো দূরের অন্ধকারে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে।

ঝর্ণা বলল, এটা কি সেই স্কুলবাড়ি!

হতে পারে। আমিতো ঝোপ-জঙ্গলে জোনাকি ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

জোনাকি পোকা আমিও দেখতে পাচ্ছি—ঝর্ণা বলল।

শরীরে জোনাকি পোকা লেপ্টে থাকলে না দেখে উপায় কি বলুন! এই জোনাকি পোকাই যত নষ্টের আদি ভূমি। দপ করে জ্বলে, আবার দপ করে নিভে যায়।

এখন ঝর্ণার কোনও উপায় নেই। লোকটাকে সহ্য করতেই হবে। একজন কাপুরুষকে ভয়ও পাওয়া উচিত নয়। লোকটার সাহসই নেই তার জোনাকি পোকায় অন্তত হাত দেয়। অযথা সারা রাস্তায় এবং বাসে সে লোকটাকে তাড়া করেছে। তখনই তার নিজের মানুষের কথা মনে হল। জোনাকি পোকায় তার অধিকার ঝর্ণা মেনে নিয়েছে। মুঠো করে সাপটে ধরলে সে যে কি আরাম পায়—তার চোখ বুজে আসে।

ঝর্ণা ভাবল সে না ফিরলেও কোনও দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই।

কারণ তার মানুষটি ভাবতেই পারবে না, হুট করে বাস ধর্মঘটের দিনে সে কর্মস্থল থেকে চলে আসবে। আসলে কামড়। ভিতরের কূট কামড় দু-দিন থেকে কেবল তাড়া করছে। ঝর্ণা নিজের কামড়েই পাগল হয়ে আছে। পাশের কোয়ার্টারে সুনীতিদির বর রাত্রিবাস করতেই সে পাগল হয়ে গেছিল কামড়ে। থাকতে না পেরে বাস ধর্মঘটের কথা জেনেও সে বের হয়ে পড়েছে। বছরও পার হয়নি, বিয়ে, হেলথ সেন্টারে কাজ—স্বামী মানুষটি রাজনীতি করে, খুবই করিতকর্মা, তাকে কাজে ঢুকিয়ে ঝাড়া হাত পা হয়ে আছে। রাজনীতি করলে এটা হয়। মিটিং মিছিল—এই আজদি ঝুটা হ্যায়, অথচ ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন

দেখছে। তার মানুষটির যে বিশ্বাস, একদিন না একদিন ক্ষমতা বদল হবেই। জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে তারা লড়ে যাচ্ছে।

ঝর্ণা এ-হেন স্বামীটির কথা ভাবতে ভাবতে মতি স্থির রাখতে পারেনি। পাশের কোয়ার্টারের সুনীতিদির বর তাকে উসকে দিয়ে গেল। তার আর কি দোষ!

সুতরাং আচমকা বাড়ি ফেরার প্রবল তাড়নায় মতি স্থির ছিল না।

বাসের ভিড়ে মাথা আরও গরম হয়ে গেছিল।

আচমকা নবাব বাহাদুর তাকে দেখলে খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলে যায়। এ-আজাদি ঝুটা হ্যায় ভুলে যাবে। ক্ষমতালিপ্সু মানুষটি তখন মাছপাতে ভাত আর খুটে খুটে খাওয়ার কাজটি শুরু করে দেবে।

তাকে স্নান করে নিতে বলবে।

বাথরুমের দরজায় শাড়ি সায়া নিয়ে দাঁড়াবার আগেই এক লপ্তে চেটে পুটে খাওয়ার কাজটি শুরু করে দেবে!

সেই সব দৃশ্য তাকে পাগল করে রেখেছে।

আরে পা দুটো ফাঁক করে রাখ।

ঝর্ণা বোঝে মানুষটার তখন তর সয় না। লালসায় জিভ থেকে জল ঝড়ে।

সারমেয়-ভোগ হয়ে সেও পড়ে থাকে।

কী আরাম, কী আরাম!

সারা রাস্তায় ছিল এই এক কামড়।

আর কতক্ষণ!

আর কতক্ষণ!

জানালায় মুখ রেখে আর কতক্ষণ!

বাসস্ট্যান্ডে এসে আর কতক্ষণ!

সুনীতিদির বরটা পারেও।

সে টের পেয়েছে,

রাতে বাথরুমের দরজা খুলে একবার। বাথরুমের দরজা খুলে দুবার। শেষরাতেও বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ পেয়েছিল। এক রাতে সুনীতিদি এত পারে! তিন তিনবার!

সারারাত তার ঘুম হয়নি।

নিজের মানুষটার উপরই তখন তার যত ক্ষোভ, অভিমান! একবার তো হুট করে চলে আসতেও পারে! তা আসবে না। অভিমানে, এবং ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে সে একবার দু-মাস বাড়ি যায়নি। শালা কামড়! আমার আছে,

তোমার নেই। দেখি কতদিন একা থাকতে পারে! আচ্ছা মানুষ, এল না। হপ্তায় হপ্তায় রবিবার, শনিবার। দুটো দিন প্রথম দিকে। এবারে হপ্তার কোটার দিনই ছিল। তবে বাস ধর্মঘট যেহেতু, হপ্তা মারতে গেলে রিস্ক আছে। স্কুল কামাই হতে পারে। ঝর্ণা গত হপ্তায় তার স্বামী মানুষটিকে বলে গেছে আসা হবে না। বাস ধর্মঘট।

নবাবি আর কাকে বলে!

স্বামী মানুষটি বলেছিল, বাস ধর্মঘট কে বলল?

কেন কাগজে পড়নি।

আরে রাখ কাগজ! কাগজ কি আর ঠিক কথা বলে! সরকারি বাসতো চলবে। সরকার বলেছে, আটশো বাস রোজ বের করবে।

ঝর্ণা না পেরে বলেছিল, হপ্তা মারতে গেলে হেলথ সেন্টারে যাবে। আমার একলার দায় পড়েনি। বাসে ট্রেনে কি দুর্ভোগ!

নবাব বলেছিল, তা হলে আসার দরকার নেই।

একটা তো হপ্তা। শুয়ে বসে, দরকার হয় মিছিলে যোগ দিয়ে, না হয় সারাদিন দাঁত খুঁটে কাটিয়ে দেব। তোমার হপ্তার কোটা তোলা হবে না। এই যাঃ!

আমার না তোমার! কথার কী ছিরি!

হপ্তার কোটা! সব বিশ্রী কথা! তার মাথা গরম হয়ে যায়। আবার শেষপর্যন্ত না এসেও পারে না। শরীর তো!

এই যে এসে গেল রানী! হপ্তার কোটা উশুল করতে। মাইরি তুমি পারও! বাস ট্রেনের ধকলেও কোনও ক্লান্তি নেই।

আর পারা যায়! একেবারে বালকের মত বল নিয়ে লোফালুফি। এখন ছাড়। আরে ছাড় না।

দেখি কেমন আছে চঞ্চুমনি।

না হবে না! হাতমুখ ধুই। হবে, পরে হবে।

কিন্তু ছাড়ার পাত্রই না।

তোমরা হলে বসুন্ধরা। চিত হয়ে পড়ে থাকবে—আমরা হালচাষ করে যাব। তোলো না, আর একটু তুলে দাও।

সে লোকটা জানেই না, সে এমন দুর্যোগের রাতে রাস্তায় আটকা পড়ে গেছে।

আসলে গরম ধরে গেলে এই হয়।

কে যে কার জায়গায় হাত রাখে, হাতের স্পর্শ কার সে নিজেও জানে

না। অকারণও হতে পারে। বাস থেকে নেমে চটি হাতে নিয়ে সে ছুটছিল। কার পেছনে, তার নিজের পেছনে নয়তো!

লোকটা জানেই না কোটা তুলতে সে এতবড় দুর্যোগ মাথায় করেও ছুটে এসেছে। অথচ এক দু'দিনের জন্য গেলে চন্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যেত না।

না মাইরি লজ্জা করে। তোমাদের কোয়ার্টারে দিদিমণিরা চেয়ে থাকে। মচ্ছব। ঝর্ণার ঘরে রাতে মচ্ছব জমবে। নিশিদিন করতাল বাজিয়ে কেত্তন।

লজ্জার কী! সুনীতিদির বর আসে। রমাদির বর একমাস থেকে গেল। বউর কাছে কে না যায়! তোমার আসলে ভড়ং। একটু বাসের ধকল, ট্রেনের ধকল পর্যন্ত সহ্য করতে পার না।

আরে বুঝছ না, তুমি বাড়ি আসছ। বাপের ঘরে আসছ। তোমার বর ঘরজামাই। ঘরজামাই গেলে লোকে হাসাহাসি করবে না! কেন গেছি বুঝতে পারবে না! কেন এত উতলা হয়ে ছুটে গেছি বুঝতে পারবে না! হাসাহাসি করবে না! তুমি বলো, সোনা লক্ষ্মী আমার, লজ্জাশরমের বালাই নেই! ষাঁড়-গোরো ভাবতে পারে। ঘ্রাণে ঘ্রাণে বলির হাটে। কী ঘ্রাণ বলো!

আবার অসভ্যতা! তোমার না, মরলেও কু-বুদ্ধি যাবে না।

আরে একটু ফাঁক করে দাঁড়াও না।

না, ভাল্লাগে না। হাত মুখ ধুয়ে আসি। বাথরুম পেয়েছে।

পরে।

দাঁড়াও।

আরে করছ কি!

দাঁড়াও না।

বাথরুমে যাব।

পরে।

কি হচ্ছে!

কিছুই হচ্ছে না।

কথার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে কখন যে স্তন খালি করে দেয়, কখন যে যোনিদেশে মুখ ডুবিয়ে কেবল পরে পরে বলতে থাকে।

ভেসে যাচ্ছে।

যাক। সব ভেসে যাক। দুনিয়া সুদ্ধু ভেসে যাক। পরে।

এইসব বলেই দু-স্তনে এবং যোনি দেশে এবং সর্বত্র এক অতি নিষ্ঠুর খেলা—কখনও অসুরের মতো উল্টেপাল্টে সারমেয় ভোগ—এতসব ভাবতে ভাবতে সে বাসে উঠেছে, ট্রেনে উঠেছে, ফের বাসে উঠেছে। উতলা হয়ে

গেলে যা হয়—তারপর ভিড়ের মধ্যে গায়ে কে সামান্য হাত দিল, আর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

সত্যি কি কেউ তার যোনিদেশ টিপে ধরেছিল! ভিড়ের মধ্যে হাত গলিয়ে দু ঠ্যাং-এর ফাঁকে যোনিদেশ সাপটে ধরেছিল! না ঘোর! সুনীতিদির এক রাতে তিন তিনবার—না ভাবা যায় না। সেই থেকে সহবাসের জন্য মাদকাসক্ত—সে তার ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারেনি।

ঘোর কাটল লোকটার পেছনে জুতো হাতে নিয়ে ধাওয়া করতে গিয়ে।

ঝর্ণা ভাবতেই পারে নি এমন দুর্যোগে শেষে পড়ে যাবে। ঝড় না বলে প্রলয়ই বলা ভাল। চারপাশের নালা ডোবা জলে ভরে গেছে। রাস্তায় জল উঠে এসেছে। লোকটা তার কাঁধে ভর করে হাঁটছে। লোকটার নাম মিহির।

মিহির সান্যাল।

মিহির সান্যাল এলাকার রাস্তাঘাট যে ভাল চেনে কথাবার্তায় তাও বোঝা যাচ্ছিল।

যেমন বলেছিল, সামনেই একটা পার্ক পাওয়া যাবে। পার্কের গায়ে একটা মালটিপারপাস স্কুল। এমনকি স্কুলটা যে সরকারি স্কুল তাও বলেছে।

সুতরাং ওখানেই ঝড়বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার মতো একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে।

মিহির বলেছে, সরকারি ব্যাপারই আলাদা।

দরজা জানালা সব বন্ধ নাও থাকতে পারে। দপ্তরীর দায় আছে সব দেখার। তবে দেখে না। সরকারি বিষয়টাই গোলমেলে।

বন্ধ করলেও চলে, বন্ধ না করলেও চলে। কৈফিয়ত নেবার কেউ থাকে না। স্কুলের বাড়িঘরে কিংবা বারান্দায় ঝড়বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কেউ গেলেও দোষের না। কারণ বিপদে পড়েই আশ্রয় নিয়েছে। ভোট আছে না!

দেখুন মিহির সান্যাল, সরকারি বললেই সব কি বেওয়ারিশ হয়ে যায়।

হয়ে যায়।

মিহির কথা বলতে চাইছে না আর। কথা বলতে যে কষ্ট হচ্ছে বোঝা যায়। তবু তার অর্ধসমাপ্ত কথা থেকে ঝর্ণা বুঝতে পেরেছে, কি বলতে চায়। যারা আশ্রয় নেয় তারা যেমন সরকারের লোক, কারণ তারা ভোট দেয়, ভোটে নির্বাচন হয়, কে থাকবে, কে যাবে, তেমনি দপ্তরী শুধু সরকারি লোকই নয়। সে ভোটও দেয়। এবং এ-জন্য কারও উপরই কোনও অবিচার হতে দেওয়া ঠিক নয়। সে দপ্তরী, স্কুলের এতগুলি ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করেও যেতে পারে, আবার বন্ধ না করেও চলে যেতে পারে। তারও তো বাড়িতে

কাজকর্ম থাকতে পারে। সুতরাং দোষের না।

সে যাই হোক মিহিরকে ঝর্ণা যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাত যতই হউক মিহির আছে, অর্থাৎ তার অবলম্বন আছে। মিহির তার মানুষের চেয়ে কিসে কম-বেশি ঝর্ণা বুঝতে পারছে না। যদি গায়ে হাত দিয়েই থাকে, যোনিদেশ সাপটে ধরেও থাকে দোষের না। নারী পুরুষ সংলগ্ন থাকবে, বিন্দুমাত্র উত্তেজনা থাকবে না—এমন নিরামিষ পুরুষ কোথাও কি আছে! থাকলেও সেই পুরুষকে ঘৃণাই করতে হয়।

কিন্তু মিহির সোজা বলেছে, মাইরি আপনার মাথা খারাপ আছে—কে গায়ে হাত দিল, আর আপনি রনচণ্ডী হয়ে বাস থেকে আমার পিছু পিছু তেড়ে এলেন, ভয়ে পালালাম, আপনি তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত ছুটতে থাকলেন। কে আপনার গায়ে হাত দিল আর আমার গাল ফর্সা করে দেবেন বলে বাস থেকে লাফিয়ে পড়লেন। আচ্ছা, হুজ্জোতি।

ঝর্ণা বলল, বাদ দিন তো। এক কথা কেন বার বার বলছেন।

ফের বলল, ঘড়ে ব্যাথা আছে?

আছে।

হাতে পায়ে জোর পাচ্ছেন?

মিহির চুপ করে আছে।

আরে চুপ করে আছেন কেন! চুপ করে থাকলে চলবে। স্কুলের ডাঙ্গাটায় উঠি, তারপর না হয় চুপ করে যাবেন।

সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শুধু হাঁটছে। কথা বলছে না! না, কথা বলতে পারছে না। মাথায় কি তার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে? তা হলে তো হয়ে গেল! ঝর্ণার মনে হল, এতে সে বেশি বিপাকে পড়ে যাবে। যদি এখন রক্তক্ষরণের ফলে মাথা ঘুয়ে পড়ে যায় এবং বেহুঁস হয়ে পড়ে তবে সে যাবে কোথায়!

মিহির তখন আবছা অন্ধকারে কি যেন খুঁজছে। সে কি সেই ছাতা মাথায় লোকটিকে খুঁজছে! তা হলেই সে গেছে। ঝর্ণা চিৎকার করে বলল, কি খুঁজছেন।

এই কিছুক্ষণ আগে কথা বলছিল! এখন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। যদিও কিছু দেখা যায় না। কথাবার্তা কি জড়িয়ে যাচ্ছে! এই কিছুক্ষণ আগে থানা পুলিশের ভয় দেখিয়েছে। বাড়ি থেকে তার থানা পুলিশের সাহায্য চেয়ে খোঁজাখুঁজি যে হবে না তাই বা কে বলতে পারে। হতেই পারে। এত রাতে বাড়ি না ফিরলে থানা পুলিশ হতেই পারে। মিহির জানেই না আজকের রাতে বাড়িতে তার ফেরার কথাই নয়। কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে বসেও নেই।

এই দুর্যোগে তার খোঁজ করার কোনও হেতু নেই। বরং মিহিরের থাকতে পারে।

ঝর্ণা দেখল, মিহির আবার কি খুঁজছে। মিহির দাঁড়িয়ে গেছে। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল। সত্যি কথা, কামড় উঠেছিল বলেই তো মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। ঝড়বৃষ্টি, বাস ধর্মঘট মাথায় করে বের হয়ে পড়েছে। এখন যে আর এক আতঙ্ক— যদি লোকটা বেহুঁস হয়ে পড়ে যায়। যদি মাথার রক্তক্ষরণে সারা শরীর ভেসে যায়, যদি জ্ঞান হারায়, যদি তার জ্ঞান না ফেরে, তা হলে তো তখন মরামানুষ কোলে নিয়ে বসে থাকার মতো। সে হেলথ সেন্টারে কাজ করে বলেই জানে মাথায় চোট পেলেই ডাক্তারবাবুদের এক কথা, বাহাত্তর ঘণ্টা পার না হলে কিছু বলা যাবে না।

আরে আপনি মিহিরবাবু দাঁতশক্ত করে কথা বলছেন কেন। মাথা ঘাড় কি অসার মনে হচ্ছে। মাথা ঘাড় কি শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর হাঁটতে পারছেন না। ঝিম্ ঝিম করছে নাতো মাথা! হুঁস আছে তো! না বেহুঁসের মাথায় হাঁটছেন!

ঝর্ণা যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে, আরে যদি হাতটাত দিয়েই থাকেন দোষ কোথায়!

তারপর থেমে ফের ঝর্ণা বলল, হাত ফাত দিলেই বরং সম্মানের। সে যে নারী, অন্তত এই সম্মানটুকু একজন পুরুষমানুষের কাছে আশা করতেই পারে।

ঝর্ণা বলল, কি ঠিক বলছি না! জোরে কথা বলবেন তো! ভূতের মতো টেনে টেনে হাঁটছেন। আপনি কোনও দোষ করেন নি। পুরুষমানুষ ছাড়া মেয়েছেলের আছেটা কি বলুন। আপনি হাত দেওয়ায় আমার বিন্দুমাত্র রাগ হয়নি। আপনি ভাল কাজই করেছেন। নারীর সম্মান রক্ষা করেছেন।

তারপর থেমেই বলল, একেই ছেনালিপনা বলে কিনা কে জানে! গায়ে হাত লেগে গেলতো চটাং করে সতীত্ব জাহিরের জন্য—ছিঃ ছিঃ!

ঝর্ণা ফের বলল, আপনি মন খারাপ করবেন না। আপনি ঠিক কাজই করেছেন। আরে ভয় পাচ্ছেন কেন আমি তো আছি। কি দেখার চেষ্টা করছেন, দেখুন বেহুঁস হয়ে কিন্তু পড়ে যাবেন না। তবে আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব। আমি আমার হাতে নিজেই অস্ত্র শুধু রাখিনি। সরকারও আমাকে নানাভাবে সাজিয়েছে। আমি দশভুজা হয়ে আছি।

জানেন তো শরীর গরম হলে মাথা ঠিক রাখা যায় না। ঝর্ণা যেন বলতে চায়, যে কোনও পুরুষই এখন সহবাসের পক্ষে উপাদেয়। আমরা এবার ঠিক স্কুলটা পেয়ে যাব। ঠিক দরজা খোলা যাবে। বড় টেবিলও পাওয়া যাবে। জামাকাপড় তো ভিজে চুপসে। সব ব্যবস্থা হবে। আপনি দয়া করে সোজা থাকুন।

আর এ-সময়ই একটা গাছ আবার হুড়মুড় করে জলার দিকে উপড়ে পড়ে গেল। গাছের একটা ডাল উড়ে গেল ঝড়ে। এবং সহসা মনে হতেই পারে ছাতার মতো ঝুপড়ি ডালপালা আকাশের নীচে ভেসে যাচ্ছে। কুহকে পড়ে গেলে মানুষ কত কিছু দেখতে পায়। মিহির তেমনই কিছু দেখছে।

তার দোষ নেই। সে ছাতা উড়ে আসছে দেখতেই পারে।

ঝর্ণা যেন প্রবোধ দিচ্ছে মিহিরকে। দেখুন ছাতা উড়ে আসছে, দেখাটা অন্যায় নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি না বলে কি আপনার ছাতায়ালা মিথ্যা হয়ে যাবে। কথা বলুন—আমি যে বুঝতেই পারছি না, আপনার হুঁস আছে কি নেই!

তার ভিজে শাড়ি হাওয়ায় লতপত করছে। যেন শরীরে তবু লেপ্টে থাকতে চায়। শাড়ি আর মাথার ওপর ওঠে যাচ্ছে না। ঝড় বৃষ্টি কখনও ব্যাপক আকার ধারণ করছে। আবার কখনও আকাশে কড়মড় শব্দ। ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে আকাশ।

আরে কথা বলুন না। স্কুলে ঢুকলে ঠিক কোথাও একটা টেবিল কিংবা বেঞ্চ পাওয়া যাবে। সেখানে গেলে, বেঞ্চে কিংবা টেবিলে শুয়ে পড়লে আরাম পাবেন। শিগগির পা চালিয়ে হাঁটুন।

না পেরে ঝর্ণা বলল, কেবল হা করে দেখছেন। নিন ব্যাগটা ধরুন।

মিহির ব্যাগটা ধরে বলল, ছাতা মাথায় লোকটা সত্যি উড়ে গেল!

ন্যাকামি করলে ভাল হবে না। কথা না বললে কী আতঙ্ক সৃষ্টি হয় বোঝেন না। ওফ যাক বাঁচিয়েছেন। ছাতা মাথায় লোকটা উড়ে গেলে ক্ষতির কিছু নেই। যে যেভাবে পাড়ছে বাড়ি ফিরছে। আপনার তো একটা ছাতা পর্যন্ত নেই!

কোনও উত্তর নেই! আরে বলছিতো ছাতা মাথায় লোকটা এখন উড়ছে, না অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কোনও জবাব নেই।

জবাব না দিলেই মনে হচ্ছে ঘিলু অকেজো হয়ে যাচ্ছে লোকটার। ঘিলু অকেজো হয়ে গেলে কি হয় ঝর্ণা ভালই জানে। সে তাতিয়ে রাখার চেষ্টা করছে মিহিরকে।

তারপর দু-পা ল্যাংচে গিয়ে মিহির বলল, ঐ যে দেখছেন না ছাতামাথায় লোকটা ফের এদিকে ফিরে আসছে।

সবই ঘিলুর গণ্ডগোল। মতিভ্রমও বলা যায়—ঝর্ণা তবু চেষ্টা করল দেখার—কোথাও কোনও ছাতা মাথায় লোক এগিয়ে আসছে কি না!

না দেখা যাচ্ছে না।

মহাপ্রলয়ের মতো আশ্চর্য কোনও ঘোর ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ঝর্ণা বলেই যাচ্ছে, আরে হাঁটুন। দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে! ঠাণ্ডায় শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছেন না। প্রলয়ে উড়ে আসা কোনও ছত্রধরকেই দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু মিহির দাঁড়িয়ে আছে।

আকাশের দিকে চোখ।

আর বৃষ্টিতে এবং হাওয়ায় কাবু হয়ে যাওয়া একটা লোক যেমন দাঁড়িয়ে থাকে। ঝর্ণা দেখল লোকটা সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

থাকুন দাঁড়িয়ে। আমি যাচ্ছি।

মিহির বলল, সেই ভাল।

তখনই চেঁচামেচি, আরে আমি যেতে পারলে আপনাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাব কেন। অচেনা অজানা জায়গায়, ঝড়বৃষ্টিতে, অন্ধকারে একা কোনও মেয়েছেলের কোথাও যাওয়া সম্ভব?

মিহির আবার চুপ করে গেল।

তবে সে হাঁটতে চেষ্টা করছে।

যাক, ঝর্ণার যেন প্রাণ এসে গেল! মানুষটাকে নিয়ে কোনও ভয়ের কারণ নেই। আগে ছিল নিজের ইজ্জত রক্ষার ভয়, এখন লোকটা মাথায় চোট পেয়ে যদি সত্যি অসার হয়ে যায়। বড় রাস্তায়ও নেই, যে কাউকে চেঁচামেচি করে ডাকবে। বড় রাস্তা থেকে রাস্তাটা নিচে নেমে গেছে, অনেকটা এসেও গেছে, সামনে আর কিছুটা হাঁটলেই স্কুল, সরকারি স্কুল বলেই দরজা জানালা কোথাও খোলা থাকলে ঢুকে পড়া যাবে।—

অথচ মিহির দেখছে ছাতা মাথায় সত্যি কেউ উড়ে আসছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের আলো ছাড়া আর এই ভূমণ্ডলে কোনো আলো নেই! লোডশেডিং অথবা ঝড়ে লাইনের তারটার ছিঁড়ে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি। অথচ মিহির সেই যে বড় রাস্তা থেকে শুরু করেছে—আসছে আসছে, দেখুন আসছে। উড়ে আসছে—এখন অবশ্য কিছুটা ম্রিয়মান, তার আতঙ্ক কম না, কোনও মানুষের ছাতা এ-ভাবে এত রাতে হাওয়ায় উড়ে আসতে পারে—যা ঝড় এবং বৃক্ষ পতন চলছে, কোনও ছাতা মাথায় মানুষ গাছের নীচে পড়ে যদি প্রাণ যায়, তবে মৃত মানুষটার ভূত হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঝর্ণা ভূতের আতঙ্কে মিহিরকে জড়িয়ে ধরল। বলল, কোথায় ছাতা উড়ছে! কোথায় মানুষ ছাতায় ঝুলছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আপনি দেখছেন কী করে? বলুন।

কথা বলছেন না কেন? আর তখনই ফের কড়কড় শব্দে ব্রজপাত কোথাও। আকাশে মেঘমালা চমকাচ্ছে।

আমি যাচ্ছি। আবদার। মিহিরের অস্বস্তি মাথায় তীব্রতর হচ্ছে।

ঝর্ণা কিছুতেই ছাড়ছে না। আমাকে ফেলে কোথায় যাবেন বলুন!

মিহির কেমন নিস্তেজ গলায় বলল, ছাতা মাথায় লোকটার মশকরা সহ্য হচ্ছে না।

আবার বিদ্যুতের ছটা। এবং সেই এক ঝড়ো বাতাস আর ভিজে শাড়ি সায়া ব্লাউজের ওপর ভেসে ওঠা স্তন এবং যোনিদেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলে মিহির অন্ধকারেই ফিক করে হেসে দিল, এ-জন্য এত হেনস্থা। যত দোষ পুরুষমানুষের। কেন যে শরীরে এ-সব রেখে দিলেন! পুরুষ না ছুঁয়ে দিলে তো সব পাথর। আপনাদের কোনও দোষ থাকে না মা জননী। দরকারে গাল ফর্সা করে দিতে পারেন, দরকারে চুমু খেতে পারেন।

আরে কথা বলছেন না কেন! আমি যাচ্ছি, আর কোনও কথা নেই। কোথায় যাচ্ছেন।

ছাতা মাথায় লোকটাকে ধরে আনতে।

এই কিরে, আচ্ছা ভূতের পাল্লায় পড়া গেল! আসলে ঝর্ণা বুঝতে পারছে না, এই দুর্যোগে তারা বেঁচে আছে, না কোনও গাছ ওপড়ে মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিল।—তারা তার তলায় দু'জনেই চাপা পড়েছে। ত্রাস যে কি ভয়ঙ্কর ঝর্ণা এই সব বিদ্ঘুটে চিন্তায় পড়ে গিয়ে কেমন তালগোলে পড়ে গেল।

আচ্ছা আমরা কি বেঁচে আছি!

মিহির বলল, বেঁচে না থাকারই কথা।

কী বললেন, বেঁচে না থাকারই কথা!

বেঁচে থেকে কি লাভ বলুন, ছত্রধরের খেলা কেমন জমে উঠেছে।

ছত্রধরের খেলা।

আজ্ঞে।

দিব্যি কথা বলছেন। মাথায় কোনও অস্বস্তি হচ্ছে নাতো! ঝর্ণা না বলে পারল না।

আবার চুপ, আর সাড়া নেই। ফের নির্বাক হয়ে গেল মিহির। কিন্তু হাঁটছে। ঝর্ণার কাঁধে ভর করেই হাঁটছে। প্রকৃতই যেন সে ছত্রধরকে খুঁজতে যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছেন? আমি যাব না আপনার সঙ্গে।

দাঁড়িয়ে থাকুন তবে। দেখে আসছি। ঐতো কাছেই।

পনেরো

লোকটাতো খুবই একগুঁয়ে। ত্যাঁদর।

সবাই।

আসলে প্রলয়ের মধ্যে মানুষ আতঙ্কে মরিচিকা দেখতেই পারে। একজন ছত্রধারীকেও মরিচিকায় ভেসে যাচ্ছে দেখতে পারে। কিন্তু লোকটা, তারপরই মনে হল ঝর্ণার, এখন কি সে লোকটা আছে! লোকটা বললে তাকে অপমান করা হয় না!

এই যে মিহিরবাবু, যাবেন না। আপনার ভালোর জন্যই বলছি। কথা বলতে পারছেন না, দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছে—হাঁটতে পারছেন না, পা মচকেছে—কী আমি মিথ্যা বলেছি—

না কোনও জবাব নেই।

অন্ধকারে লোকটা ল্যাংচাচ্ছে। কথা বলতে পারছে না। রাস্তা কর্দমাক্ত, পিছল, পা টিপে টিপে না হাঁটলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পড়ে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু।

তারপরই সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে হাত চেপে ধরল—

চলুন। ঐতো আবছা মতো দেখা যাচ্ছে—স্কুলবাড়ি!

মিহির দাঁড়িয়েই থাকল।

ঝর্ণা বলল, মনে হয় আমরা এসে গেছি।

তারপর বলল, আচ্ছা আপনি কি মিহির সান্যাল!

এই প্রগাঢ় অন্ধকারে, এই দুর্যোগে ঝর্ণা তার নারীনক্ষত্র চিনে রাখতে চায় কেন!

কী বলছি শুনতে পাচ্ছেন!

মিহির দাঁড়িয়েই থাকল।

আরে হাঁটুন।

ঐতো ঝড়ে দরজাজানালা খটাস খটাস শব্দ করছে।

যেন কোনওরকমে ঘাটের মরা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ঝর্ণা। কথা না বললে খুবই বিপদ—কোনওরকমে একটা দেবদারু গাছের নীচে ঠেলে তুলল মিহিরকে। গাছের নীচে দাঁড়ানো ঠিক হবে না। ঝড়ে গাছটা এখনও সোজা হয়ে আছে। তবে পড়ে গেলে দু'জনে গাছ চাপা পড়ে মরবে। ঝর্ণা কোনওরকমে ঠেলতে ঠেলতে মিহিরকে স্কুলের বারান্দার ওপর তুলে দিয়ে গেল। দরজা খোলা আছে, ঝড়ে দরজা জোর ধাক্কা খাচ্ছে—এবং ঝর্ণা কিছুটা

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আর যাই হোক ঝড়ো হাওয়া কিংবা বৃষ্টির প্রলয় থেকে প্রাণরক্ষা করা গেছে।

আরে করছেন কি! বসে পড়লেন! এখানে বসলে হবে না। ভিতরে ঢুকতে হবে। বারান্দা বৃষ্টির ছাটে জলে ভেসে গেছে, ওঠোন—ভিতরে দেখি কি আছে! এখানে শুয়ে পড়লে আপনাকে তুলতে পারব না। প্লিজ কথা বলুন।

শরীর কি অসার মনে হচ্ছে!

আরে বলবেনতো অসার লাগছে কি না! আমাকে ধরুন, ঝর্ণা তার জলে ভেজা লতপতে সায়াশাড়ি সামলে, মিহিরকে ছেঁচরাতে ছেঁচরাতে ক্লাশঘরের ভিতর নিয়ে ফেলল। এবং অন্ধকারের সেই এক নিস্পৃহ ছবি। একটা জোনাকি পোকা উড়ছে। জোনাকি পোকা জ্বলছে নিভছে।

আবার কড় কড় করে বিদ্যুৎ চমকাল।

জানালা খোলা, দেয়াল কোনদিকে, জানালা কোনদিকে মুহূর্তে টের পেল ঝর্ণা।

আবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

সে বুঝল এই ঘরটা বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ঘর। যত্র তত্র ভাঙ্গা টুল, পায়া খসানো টেবিল, একটাও আস্ত টেবিল নেই। বিদ্যালয়ের কিছু অতিরিক্ত চেয়ার টেবিলও পড়ে আছে।

ঝর্ণার সহসা মনে হল মিহিরবাবু লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিলেন, —এদিকটায় বেশ শিলাবৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ এবং সবুজ ঘাস সব সাদা হয়ে গেছে —কোনও বরফের দেশের মতো অবস্থা। শিলাবৃষ্টিতে প্রবল কনকনে ঠাণ্ডায় মিহিরবাবুর হাত পা আরও অসার হয়ে যেতে পারে। মেঝেতে ফেলে রাখলে আর ভিজা জামাকাপড়ে ফেলে রাখলে আরও অসার হয়ে পড়বে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এবং তার মনে হল, উষ্ণতার খোঁজ না পেলে, মিহিরবাবু সত্যি মারা পড়বেন। কারণ মাথায় চোট পাওয়া মানুষটা জ্ঞান হারালে তাকে রক্ষা করাই কঠিন হবে।

এই প্রথম সে মিহিরকে বলল, প্লিজ আপনি কথা বলুন।

এই প্রথম মনে হল ঝর্ণার মিহিরবাবু মরে গেলে খুনের দায়ে তাকে পড়তে হবে।

বাসের সবাইতো চিৎকার করছিল, আরে মহিলার কি মাথা খারাপ আছে! আরে আপনি বাস থেকে নেমে কাকে তাড়া করার জন্য ছুটছেন! ভদ্রলোকের কি দোষ! এই ঝড় বৃষ্টিতে কী হয়ে আছে রাস্তাঘাট!

কাজেই ঝর্ণা টের পেয়েছিল তাকে বাসের সবাই যথেষ্ট লক্ষ্য করেছে।

বাসের সেই খুনি মেয়েটাকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হবে না।

কিছু একটা যদি হয়ে যায়—যদি ট্যাঁসে যায়।

ঝর্ণা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

পকেটে লাইটার খুঁজছে।

আর তখনই মনে হ'ল হায়েনার মতো এক অলৌকিক এবং ভয়ঙ্কর খিক খিক হাসি। হায়েনার। না অন্যকিছু!

মানুষের হাসি! মানুষ কি পাগলের মতো হাসে!

তার শরীর আতঙ্কে আরও শীতল হয়ে গেল। তারও দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছে।

সে ডাকল, মিহিরবাবু প্লিজ সাড়া দিন—এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মেঝেতে পড়ে থাকলে আপনার হৃদপিণ্ডও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আপনার শরীর এমনিতেই সাপের মতো শীতল। আপনি শুনতে পাচ্ছেন না, এই অন্ধকারে, না তার বাইরে কোথাও এক ভয়ঙ্কর বিষাদের ঢেউ ভেসে আসছে হায়েনার হাসি হয়ে।

তারপরই ঝর্ণা ভাবল, সে জীবনেও জ্যান্ত হায়েনা দেখেনি—হায়েনার হাসি কি রকম হয় সে জানে না। থেকে থেকে, এই হাসি ক্রমাগত ঝর্ণাকে আরও নিস্তেজ করে দিচ্ছে। সে একা থাকলে লাফিয়ে দরজা পার হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে পারত—কিন্তু তাড়া করা মানুষটাকে এমন অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে যায় কি করে! মানুষটার সত্যি যেন কোনও হুঁস নেই। আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই তার মনে হল পাশেই একটা টেবিল। দরজা জানালা খোলা বলে ভিতরে জলের ঝাপটা আসছে।

জানালা বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

আবার খিক খিক হাসি।

আতঙ্কে ঝর্ণা কেঁদে ফেলল।

মিহিরবাবু, আর যাই করুন, প্লিজ আপনি মরে যাবেন না। কথা বলুন প্লিজ। মরে গেলে আমি ঠিক খুনের দায়ে পড়ে যাব। পুলিশ আমাকে ঠিক খুঁজে বের করবে। খবরের কাগজ, রেডিও সব হন্যে হয়ে ঘুরছে খবরের আশায়। স্কুলের ঘরে মানুষের মৃতদেহ। প্রলয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েও বাঁচতে পারেনি। মাথার পেছনে, কেউ শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করেছে। রক্তপাত যদি হয়। প্রবল বৃষ্টিতে রক্তের ধারা কমে এলে জলে ভেসে গেছে সব। মাথার পেছনের ক্ষতস্থানটি পুরোমাত্রায় দগদগে ঘা হয়ে গেলে, কিংবা না গেলেও পুলিশ ঠিক খুন বলে কেস দিয়ে দেবে। মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

আছাড় পড়ে মাথার পেছনে চোট পেয়েছে, এমন কোনও ধারণারই বশবর্তী হবে না পুলিশ। কারণ খুনের কেস দিলে সহজেই নিস্তার পাওয়া যায়!

কারণ এইভাবে কাগজের প্রথম পাতায় হেডিংও হয়ে যেতে পারে সে। ঝড়ে কিংবা প্রলয়ে মৃত নয়, কেউ এই প্রলয়ের অছিলায় খুন করে এখানে ফেলে রেখে গেছে!

লোকটা কে?

বাসের লোকেরা জানে না, ঝর্ণাও জানে না লোকটা কে!

কিন্তু যেখান থেকে লোকটা হারিয়ে গেছে, তারা তো খোঁজ করবে।

ঝর্ণাতো জানে না, লোকটার নাম মিহির সান্যাল, লোকটা খবরের কাগজে কাজ করে। আবার লেখা লেখিরও অভ্যাস আছে। 'পোড়া কয়লা' বলে তার গল্প গত রবিবারেই প্রকাশিত হয়েছে একটি বড় কাগজের সাহিত্যের পাতায়।

ইস্ একবার কেন যে মনে হয়নি, আপনি কোথায় থাকেন?

তা অবশ্য ঝর্ণা জানে, লোকটি নিজেই বলেছিল, জ্যাংরার দিকে থাকি। জ্যাংরা জায়গাটা যে আরতি সিনেমাহলের কাছে এমনও বোধ হয় বলেছিল। কিন্তু জ্যাংরা বললেই কি খুঁজে বার করা যাবে! এই বিধ্বস্ত অবস্থায়ও ঝর্ণার যেন মনে হল, মিহির সান্যাল নাম লোকটার। মিহির সান্যাল! হ্যা যেন বলেছিল, মিহির সান্যাল।

সে কিছুটা থতমত খেয়ে গেল। অন্ধকারেই সে টেনে তুলছে মিহিরকে। প্রথমে বুক পর্যন্ত তুলে সে চেঁচিয়েছে, আরে আপনার এতটুকু ক্ষমতা নেই, একটু সাহায্য করুন। একটু টেবিলে ভর দিয়ে দেখুন, চেষ্টা করুন। মনে হ'ল কোনওরকমে কোমর পর্যন্ত তুলে এনে আর পারছে না। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ছে।

আরে শুনতে পাচ্ছেন কেউ ঘরে কিংবা বাইরে আছে—কুকুর বিড়াল হতে পারে—আতঙ্কে মনে হচ্ছে খিক খিক হাসি—আপনার কিছু কি মনে হচ্ছে না! এতটা নিস্তেজ হয়ে গেলে, আমি কি করি—আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। দোহাই আপনার, নিজেকে শক্ত করুন—আমিতো আছি। এমন একটা ভুতুরে হাসিতেও আপনার বোধবুদ্ধি এমন খাম হয়ে আছে।

কোনও কুকুরের গোংগানি কি কখনও এমন খিক খিক হাসির মতো শোনায়।

মাথা ঠিক নেই। ভুল শুনছে নাতো!

বাসে ছিল এক রকমের আতঙ্ক।

কার হাত কার পাছায় ঘোরাঘুরি করছে। সে বাসে সারা রাস্তায় পাছা

সামলেছে। শুধু কি পাছা সামলালেই হবে! সামনে কেউ হাত বাড়িয়ে দিলে যে শরীরের সর্বস্ব খোয়া যায়। খোয়া গেলেই অপবিত্র হয়ে যাওয়া। সতীত্বের অবমাননা। ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছে সতিচ্ছেদ একটা ভয়ঙ্কর সীমারেখা। জন্মের সঙ্গেই এই সতিচ্ছেদ তার আব্রু রক্ষা করে আসছে। তার শরীর প্রস্ফুটিত হতে থাকলে, কিংবা শরীর বিকশিত হতে থাকলে সে দেখেছে তার নিটোল স্তন, দু-হাতে প্রয়োজনে নিজেই টেপাটেপি করেছে, এবং যেদিন রমেন নামক এক সহকর্মী ভোটের পোলিং অ্যাজেন্ট হয়ে এক সঙ্গে চল্লিশ মাইল জিপগাড়িতে পাশাপাশি বসেছিল—সেদিনই শরীরের কামড় বস্তুটি যে কী টের পেয়েছিল।

রমেনকে নিয়ে শোওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল।

একই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরি করার সুবাদে রমেনই তাকে প্রথম যৌনতা বস্তুটিকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেয়। কারণ রমেন তার স্ত্রীর কাছ থেকে যৌনতায় অতৃপ্ত হয়ে, ঝর্ণাকে টার্গেট করেছিল।

তারা একবার ধরাও পড়ে যায়।

তারপর দু জায়গায়, এবং রমেন ছুটি ছাটায় তার কাছে আসত বাড়ির নিকট আত্মীয় সেজে— এবং পরে আরও কামনাবাসনায় জর্জরিত হতে থাকলে ঝর্ণা একজন পার্টি কর্মীকে তার শরীরে ভিড়িয়ে দেয়।

আর কেন যে মনে হয় শরীর শরীর চায়।

ভালবাসা সত্বীত্ব সবই খোসার মতো— শরীরে জড়িয়ে থাকে, প্রয়োজনীয় উপাদান থাকলে সব পুরুষই এক, সব নারীও এক।

আরে হাতটা তুলুন।

কে তোলে!

ঝর্ণা টেবিলে হাত তুলে দিল, পা তুলে দিল, এবং লাইটার জ্বালিয়ে দেখল মিহিরের মুখ বড়ই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কেমন রক্তশূন্য। তার ওম প্রয়োজন— উষ্ণতা প্রয়োজন। তারপর বাধ্য হয়ে শরীরে রক্ত সঞ্চালনের জন্য ঝর্ণা প্রথমে স্তন, এবং পরে যোনিদেশ ব্যবহার করল। হাত নিয়ে মাখামাখি করল —তবে মিহিরের কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

ঝর্ণা যেহেতু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করে, এইসব রুগি ঘাটাঘাটি তার অভ্যাস আছে। সে অন্ধকারেই নাড়ী দেখল মিহিরের। নাড়ী তার স্বাভাবিক। তবে সামান্য চঞ্চল, আবার মনে হচ্ছে কিছুটা শিথিলও। হয়ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাথা থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। কারণ প্রবল হাহাকার বাতাস আর বৃষ্টির তাড়নায় ঘাড়ের কাছে ঠিক মাথার মীচটায় আঘাত পেলে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে

যায়, ঝর্ণা তা ভালই জানে।

মিহির মরে গেলে তাকে পালাতে হবে। যে দিকে চোখ যায়, অন্ধকারে প্রলয়ের হুমকি সব অগ্রাহ্য করে পালাতে হবে। না পালালে সহজেই খুনের দায়ে পুলিশ কেসে জড়িয়ে দেবে।

এই....

কথা বলুন।

কোথায় কষ্ট হচ্ছে।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে!

কিছুই কি আপনার বোধগম্য হচ্ছে না!

আমি ঝর্ণা। ভাবল, চিমটি কেটে দেখে।

ঝর্ণা এবার নাকের কাছে হাত নিয়ে বুঝল, শ্বাস প্রশ্বাসে কোনও খামতি নেই। বুকে কান পেতে শুনল—কোথাও কোনও অনিয়ম নেই।

শুনছেন।

শীতে কি বরফ হয়ে যাচ্ছেন।

উষ্ণতা টের পাচ্ছেন না।

ঝর্ণা, নাড়ি বিশেষজ্ঞ নয়, তবে এই সব রুগি ঘাটাঘাটির তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ঠাণ্ডা থেকে আপাতত মিহিরকে রক্ষা করা দরকার। জানালা বন্ধ করতে গিয়ে বুঝল, হবে না। সিটকিনি ভেঙ্গে গেছে—সরকারি স্কুল হলে যা হয়—শিক্ষকরা কোনওরকমে ক্লাশ সেরে, কোচিং এর ধানদায়। সেক্রেটারি স্কুলের ফাণ্ড মেরে পয়সা হাপিস করার মতলবে থাকে—কোনও আদর্শ ফাদর্শের ধার ধারে না। শুধু দৌড়। টাকা টাকা—টাকা মাটি মাটি টাকা, কী হবে কার টাকা ভেবে। শুধু ঘরে তুলতে পারলেই লাভ। সে টাকাই হোক আর মাটিই হোক। যা হচ্ছে—মাটির দামও তো জোর দৌড়াচ্ছে। সুবিধেমতো জায়গা থাকলে, এখন গ্রামাঞ্চলেও লাখটাকা দর হাঁকছে। আর পার্টির হাত তো আছেই। ঝর্ণা, তার স্বামী হেরম্ব— পার্টি কর্মী, নানাভাবে জমি হস্তান্তরিত করে, সব খবর দিচ্ছে। পার্টি কর্মীর এক ধমকে বিডিও জামাকাপড়ে পেচ্ছাব করে দেয়। দিলেই হল বদলি করে—ঝর্ণা বলেছে—সরকারতো আছে।

সরকার! রাখো তোমার সরকার। সব চোর। জানো-চুরি করতে না জানলে আখের অষ্টরম্ভা বোঝো। ওগো চঞ্চুমনি—দ্যাখ না কি করি! মহিমদাকে বলেছি, দাদা ঝর্ণার পোস্টিংটা এবারে দেখুন।

অর্থাৎ শরীর তাতানোর সময়, হেরম্ব বোঝে, লোভ বড় কুহকিনী—ঠিক পেতে দেবে, ঠেলে ফেলে দেবে না। কত যে অসাধু কাজ করেছে হেরম্ব!

ঝর্ণা এ-সব আগে জানতই না। সব নাকি ঝাঁকের কই। তারা ক্ষমতায় এলে দেশে গরীব থাকত না—ক্যাডারবাহিনী সদস্যরা প্রকৃতই গরীব, এবং ক্ষমতায় এলে এরাই হয়ে উঠবে ডাংগুটি। ডাংগুটি বোঝো!

না।

আরে ডাংগুটি খেলে নিত্যদিন কাগজে বড় বড় খবর হয়ে যায়। কী চিজ। ডাংগুটির হাতটাও যদি থাকত—প্র্যাকটিশ বন্ধ না করে দিতাম—ইস সুবর্ণ সুযোগ এ-ভাবে হাতছাড়া করার কোনও অর্থ হয়।

আসলে হেরম্ব তাকে ভোগ করতে চায়—নানা প্রলোভনে ফেলে ভোগ করতে চায়। তবে মহিমদা তাকেও বলেছে, তিনি চেষ্টা করছেন, হয়ে যাবে মনে হয়। আর কিছুদিন চাপে রাখলেই অফিসার বাবুটি পোস্টিং দিতে বাধ্য হবে। কাছাকাছি কোথাও কাজটা হয়ে গেলে তারও সুবিধা হেরম্বরেও ভোগ লালসা নিত্যদিন তৃপ্ত হবে।

কিন্তু পুলিশ কেস হলে?

যদি হয়।

ঝর্ণা টেবিলের কাছে গিয়ে লাইটার জ্বেলে দেখল। সে নিজেও শীতে হি হি করে কাঁপছে। ভিজা জামা কাপড়ে মিহিরও পড়ে আছে। কোনও বোধগম্যি নেই। কেমন ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে।

সে তাড়াতাড়ি কয়েকটা ভাঙ্গা টুলের পায়া জড় করতে থাকল। আগুন জ্বেলে শাড়ি সায়া শুকিয়ে নেওয়া দরকার। ঘর গরম হলে মিহিরবাবুও হয়তো চোখ মেলে তাকাবেন—কিন্তু থেকে থেকে খিক খিক হাসি কিছুতেই যে থামছে না—দমকা হাওয়ায় আগুন নিবে যাচ্ছে। দরজা হাওয়ায় খুলছে। দরজাও বন্ধ করা যাচ্ছে না। দরজায় ঠেস নেই, সিটকানি নেই। আর একটু কোনার দিকে গেলে হয়, এবং এ-সময় ঝর্ণা আগুন জ্বালাবার কথা বলছে মিহিরকে। আশার কথা বলছে। এখুনি ঘর গরম হয়ে যাবে। আমরা এই প্রবল ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারব। আপনার জামা প্যান্টও খুলে দিচ্ছি। লজ্জা পেলেও কিছু করার নেই।

আমরা এখন প্রকৃতির জীব হয়ে যাব।

আপনার কি কোনও অসম্মতি আছে?

আরে আপনার অনুমতি না পেলে সব আপনার খুলে ফেলি কি করে! একেবারে দেখছি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। কোনওভাবে আপনার হুঁস ফিরুক আপনি চান না।

আরে ভয়ের কি আছে!

মাথায় চোট পেলে সাময়িক বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। কত দেখলাম।

খুলছি কিন্তু।

শেষে আবার দোষ দেবেন না।

আমিও খুলছি। আগুন জ্বলে উঠছে। দেখন না—এই ভিজা ঠাণ্ডায় আগুনের কী লীলা।

ঝর্ণা অবলীলায় তার শাড়ি সায়া ব্লাউজ খুলে প্রথমে জল চিপে নিংরে নিল্।

তারপর মিহিরের জামা পা-জামা জল চিপে যতটা পারল হালকা করে নিল।

তারপর তার সায়া ব্লাউজ শাড়ি টেবিলে বেঞ্চির সর্বত্র ঝুলিয়ে দিল। হাওয়ায় উড়ছে। তবে খুব বেশি জলজ হাওয়া এদিকটায় ঢুকতে পারছে না।

তবে ঝর্ণা নিজের চেয়ে মিহিরের পোষাকের প্রতি বেশি যত্ন নিল। এই যে অবস্থা মানুষটার, নির্ম্মই বলা যায়, তাঁর জন্য সেই দায়ি।

তাঁর হুঁস ফিরে আসা দরকার।

এমন কি বেশি কিছু আঘাত মাথায় চিৎ হয়ে পড়ে যাওয়ায় লেগেছিল। এমন ভাবল ঝর্ণা।

তাঁর শিরা উপশিরা কি মাথার এতটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে যে মিহির আর হুঁস ফিরে পাবে না।

চিৎ হয়ে পড়ে যাওয়াতেই ঝর্ণা তাঁর নাগাল পেয়েছে। না হলে একজন পুরুষের পিছনে ধাবমান এক নারীর সাধ্য কি তাকে কব্জা করতে পারে।

ঝর্ণা অবশ্য প্রবল বৃষ্টির মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করতে পারেনি। সব ঝাপসা। কেবল, গাছের মৃত ডাল, কিংবা একটা আস্ত গাছ নাচতে নাচতে মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে। তাদেরও উড়িয়ে নিত, তবে কী কারণে যে এই মহাপ্রলয় থেকে রক্ষা পাওয়া গেল—কারণ ঘুর্ণিঝড়টা নিশ্চয়ই তাদের পাশ কাটিয়ে দুরে কোথাও চলে গেছে।

ছেঁড়া কাগজ, কিংবা উড়ে আসা ঝরাপাতাও ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।

কাঠকুটোর মতো এই সব তার সংগ্রহ—এবং এতেই অগ্নি সংযোগ করলে লাইটারের আগুনে ফরফর করে পাতা কিংবা কাগজে আগুন ধরে গেল, কিছু ঝরাপাতা আগুনের চেয়ে বেশি ধোঁয়া উগড়ে দিল। ভেজাপাতার যা স্বভাব। এবং এবারে ঝর্ণা তার ওপর ভাঙ্গা টুলের পায়া দু-তিনটে হাল্কাভাবে সাজিয়ে দিল, সেই যজ্ঞের মতো যেমন তার বিবাহলগ্নে পুরোহিত আগুন সাজিয়ে খই দহি এবং ঘি সহ অগ্নেয় স্বাহা বলে যজ্ঞস্থলে সব অর্পণ করে তাকে

মাত্রারিক্তভাবে সতিসাধ্বি প্রমাণের চেষ্টায় ছিল।

এও এক ভয়ঙ্কর আদি এবং অনন্তের সাধনা—শরীর অবশ, মস্তিষ্ক ক্রিয়া করছে না—এবং আগুন জ্বলে ওঠায় এই প্রথম ঝর্ণা টের পেল এই ঘরটি বেশ বৃহদাকার, এবং হলঘর বলাই চলে, সামনের দিকটায় বাতিল টুল টেবিলের পাহাড় এবং মনে হয় সিঁড়ির মতো উপরের দিকে উঠে গেছে।

ঘরটিতে কোনও জনমানবের সারা নেই। এমনকি ভূতগ্রস্ত হয়ে কোনও জীবজন্তু অর্থাৎ কোনও সারমেয় পর্যন্ত এই ঘরে এখন পর্যন্ত আশ্রয় নেয়নি—কেবল মনে হল দেয়ালের শেষ দিকটা একটা নীল রঙের পলিথিন ঝুলছে, অথচ হাওয়ায় ওড়াওড়ি করছে না।

তারপরই মনে হল ভিতরের দিকটায় টুল টেবিলের জঙ্গলে এবং ঐ পর্দার আড়ালে—কারণ নীলরঙের পলিথিন—যে কারও আব্রু রক্ষা করছে না—আর ভেজা স্যাৎস্যাতে একটা দুর্গন্ধও যেন তার নাকে এসে লাগল। পর্দার আড়ালে কি আছে কে জানে!

তা হলে কি মিহিরবাবুর আগেই কাউকে খুন করে এই মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে গেছে কেউ। গ্রীষ্মের ছুটি—একজন দারোয়ান অন্তত স্কুলের পাহারায় থাকা দরকার ছিল। এখনতো সারা দেশে খুনখারাবি চলছে।

হয়ত আছে—বিশাল এল অক্ষরে এই বিশাল সরকারি স্কুলে কোথায় কি আছে ঝর্ণা জানে না। অবশ্য আগুন জ্বলে ওঠায় তার কিছুটা সাহস জন্মাল, তবে কিছুদুরে গিয়ে পলিথিনের পর্দা তুলে দেখার সাহস হল না।

আর তা ছাড়া দরজাটা বন্ধ করা যাবে না।

এতক্ষণ আসলে ঝর্ণা নিজেও বেহুঁস ছিল। আগুন জ্বলতেই চোখে পর্দা ভেসে উঠল, নাকে কিছুটা কুটগন্ধ কিংবা পচাগন্ধ বলা যায়—সে নাক টানছে।

এই হলের দরজাগুলো অতিকায়। পর পর এই সব লম্বা তিনটি দরজা সে দেখতে পাচ্ছে। পরের দরজাগুলি ডাঁই করা টুল টেবিল এবং বেঞ্চের তলায় পড়ে গেছে।

তার পাশে কোথাও একটা পলিথিনের পুঁটলিও আছে—যা খুবই সুবৃহত, একজনের পক্ষে মাথায় তোলা কঠিন।

আগুন জ্বলে উঠতেই সেই খিক খিক হাসি হাওয়ায় যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল।

না আর কোনও শব্দ উঠছেনা।

আসলে দরজা খোলা থাকলে যে কেউ নানা আগ্রহে এইখানে ঢুকে যেতে পারে।

সেটা বাঁচার আগ্রহ হতে পারে।

মরারও আগ্রহ হতে পারে।

কিংবা জীবনের আগ্রহ।

যেমন এই যে ঘর-দেয়ালের একদিকের জানালা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে, আর এই পাশের দেয়ালের বিশাল দরজা দিয়ে সেই হাওয়া বের হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে ভ্যাপসা গরম কিংবা ভ্যাপসা ঠাণ্ডায়ও হল ঘরটা আবাসযোগ্য আছে—

তবু ঝর্ণা সন্তর্পনে টেবিলের একটা বড় পায়া আত্মরক্ষার্থে হাতের কাছে রেখে দিয়েছে।

প্রবল হাওয়ার দিক পরিবর্তনের সময় কোনও ঘর্ষনজনিত কারণে শব্দ তৈরি করতে পারে।

পরিশেষে যা দাঁড়াল, ঝর্ণা আর দরজা বন্ধ করতে সাহস পাচ্ছে না। কিছু ভাঙ্গা টুল টেবিল দরজায় চাপা দিয়ে দিলে দরজারও আর নড়ার ক্ষমতা থাকবে না। মুক্ত বাতাসের জন্য দরজা এবং তার বিপরীত দিকের জানালা খুলে রাখাই বাঞ্ছনীয়—ঝড়ের গতি কমে আসছে। বাতাসে আর শো শো শব্দও নেই। কেবল কোনও ঝোপ জঙ্গলে কিছু ডাহুক পাখির কলরব শোনা যাচ্ছে।

এবং তার পাতলা শাড়ি সায়া ব্লাউজও কিছুটা বাতাসে এবং কিছুটা আগুনের উত্তাপে শুকিয়ে উঠেছে। সে তার সায়া তিন চার ভাঁজ করে আগুনের ওপর ধরে কিছুটা উত্তাপ সঞ্চয় হলেই মিহিরের কাছে ছুটে যাচ্ছে। এবং ঘাড়ের ওপরে উত্তপ্ত সায়া দিয়ে সেঁক দিচ্ছে।

এই করে যাচ্ছে—এবং মিহিরের শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সে ডাকল, কি শুনতে পাচ্ছেন—এখনও কি মাথা অসার বোধ হচ্ছে। আরে কথা বলছেন না কেন!

সে যে কী করে! তার কান্না পাচ্ছিল।

চারপাশে তাকাতেই এই বেহুঁস লোকটি ছাড়া ইহজগতে তার যেন আর কোনও অবলম্বন নেই এমন মনে হ'ল ঝর্ণার। এ-রকম নির্জন একটি মাঠের স্কুলবাড়িতে রাতের অন্ধকারে আটকা পড়ে গিয়ে সে বড়ই অসহায় বোধ করতে থাকল।

আবার সেই খিক খিক হাসি।

ঝড় থেমে গেছে তবু কেউ হাসে। অন্ধকারে কারা হাসে!

মেঘের গর্জন নেই, মেঘ হালকা, আকাশ আর তেমন মেঘাচ্ছন্নও নেই। এবং অচিরেই মেঘমালা মুক্ত হয়ে ধরণী আবার শান্ত হয়ে উঠবে।

তবু কেউ খিকখিক করছে কেন। হাসছে যেন। কেউ তামাসা করছে যেন।

সে আতঙ্কে এবার, সে মানে ঝর্ণা মিহিরকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকল। ওঠুন,

প্লিজ। আমি আর পারছি না।

মিহির এত সুন্দর, আর মুখের মধ্যে একটি কিশোর সুকোমল হাসি যেন লেগে আছে—এমন নিষ্পাপ মুখ সে যেন কখনও কোথাও দেখেনি। এই তরুণ যুবকের এমন দারুণ অবহেলার হাসি দেখে সে বলল, আমি বিশ্বাস করি, আপনি কিছুই করেননি। আপনার মতো মানুষ কিছু করতে পারে না। প্লিজ ওঠেন।

তখনই ঝর্ণার মনে পড়ল, সে শাড়ি পরেছে, কিন্তু নীচে সায়া পরেনি। সে দেখছে, আগুন এবং হাওয়ায় তার পাতলা সিফনের শাড়ি শরীরে আবার উড়ছে। সে কোনও রকমে শাড়ি আল্গা করে আড়ালে সায়া পরে এবং ব্লাউজ গায়ে দিতেই ভাঙ্গা টেবিল চেয়ারের স্তূপীকৃত আর্বজনার ওপার থেকে কারা যেন গান গাইছে। —পরেছি বেগুনের মালা, ভাত খেয়ে আর কাজ কি! পালা এবার সাঙ্গ হবে—আনন্দে তাই আত্মহারা।

বেগুনের আর দোষ কি!

সে কেমন, পাগলের মতো মিহিরকে ঝাঁকাচ্ছে—সেও কি এই বেঘোরে নানা মরিচিকার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে, পরেছি বেগুনের মালা—ঠিক হেরম্ব মানে তার আপাতত স্বামী মানুষটির অবিকল গলা যেন। বাজার থেকে এক কেজি বেগুন এনে চাক চাক করে তাকে কেটে দিতে বলেছিল, এবং পাঁচটি মালা লোকাল কমিটির কমরেডের নির্দেশ অনুসারে মিছিল শুরু করার আগে পাঁচজনকে পরিয়ে দিয়েছিল—কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ভাত নেই তো বেগুন খেলেই হয়। বেগুনে দোষ কি! পার্টি থেকে সারা রাজ্যে বেগুনের মিছিল হয়ে গেল—আর সেই গান পাশের ঘরে কারা এখন সমস্বরে গায়। তাজ্জব কান্ড।

কমরেডদের ব্যাপার স্যাপার সে মানে ঝর্ণা ভাল বোঝে না। সে রাজনীতি করে না। হেরম্ব স্কুলের লাস্ট বেঞ্চার ছিল, সব বিষয়ে পাশ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না—বছর বছর ফেল করলে বাপ মা-ই বা যায় কোথায়—বলেছিল হুক্কা হুয়ার দলে নেমে যা—যদি কিছু হয়।

কারণ ঝর্ণা জানে তখনকার দিনে কমরেডরা কেউ কেউ সম্মান পেতেন, কারণ, তাঁদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু বার বার ভোটপ্রার্থী হয়ে বার বার হেরে গেলে, শ্রদ্ধা মলিন হতে থাকে—তারপর আবার চীনের আক্রমণ, মানুষজন ক্ষিপ্ত হতেই পারে, তাচ্ছিল্য জনগণের বাড়তে থাকে। তাই কংগ্রেসের কাছে এরা কখনও হুক্কাহুয়া পার্টি কখনও মাকু পার্টি।

আবার কিছু কমরেড চীন পন্থী হয়ে গেল, অর্থাৎ ঠিক চীনপন্থী নয়, তবু

খাঁটি সোনা, মার্কসবাদি কম্যুনিস্ট সংক্ষেপে জনগণের মধ্যে মাকু পার্টি হয়ে বিশেষ পরিচিতি লাভ করায় হেরম্ব সেই দলে ভিড়ে পড়ল—পার্টি অফিসে ফুট ফরমাস খাটত, হেরম্ব স্কুল ছেড়ে ভালই করেছিল—হোলটাইমার হয়ে গেলে ভাতা পেতে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণাকে প্রেম নিবেদনের নামে রাস্তার মোরে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। ক্রোশখানেক দূরের একটা স্কুলে তাকে দিয়ে আসত—এ-ভাবে জনগণের সেবা শুরু হলে সে ক্রমে মার্কসবাদি কমরেড—এবং তাকেও অফিসে দু-একবার নিয়ে গেছে, মিছিলেও নিয়ে গেছে—হুক্কা হুয়া পার্টি থেকে মাকু পার্টি হতে প্রায় আটদশ বছর কাবার করে দিল। সব শেয়ালের একরা—জনগণের মধ্যে এই ছিল জনশ্রুতি। সাধারণ মানুষ তখন কংগ্রেস বুঝত। বামপন্থীরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, কংগ্রেসেও চোর বাঁটপাড় কম ছিল না—তাদের আমলেই ঘুষ শব্দটি ওপরি হিসাবে চিহ্নিত ছিল, একবার বাবা তার সম্বন্ধ দেখে এতই খুশি যে বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, শুধু সরকারি চাকরিই করে না ওপরি রোজগারও মেলা।

কথায় কথায় হেরম্ব বলত, নির্দেশ।

কিসের নির্দেশ—কার নির্দেশ।

ওপরের নির্দেশ, একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে হেরম্ব বলেছিল, তুমি বুঝবে না। ঝর্ণা ডাঙ্গে সাহেবের নাম জানত—এটা কি তাঁর নির্দেশ।

বেগুনের মালা পরে মিছিল। অনুষ্ঠান মঞ্চ বেগুনের নানা বাহারে সজ্জিত—আর চিৎকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিপাত যাক। পার্টিতে তখন জ্যোতি বসুর প্রভাব বাড়ছে।

কিছু বললে নাতো—

কি বলব?

ডাঙ্গে সাহেবের নির্দেশ—

ধুস ডাঙ্গে সাহেব—তিনি কবেই প্রতিক্রিয়াশীল। ওর নাম মুখেও আনবে না।

সাধে আমার বাবা মা হুক্কা হুয়া পার্টি বলত। সারা রাজ্যে কি তোলপাড় শুরু করে দিলে—সব পোস্টার দেয়ালে দেয়ালে, হাতে মাথায় ঝুড়ি, বেগুনের দেখরে, কিবা বাহার—গান বাঁধা হয়ে গেল, পরেছি বেগুনের মালা ভাত খেয়ে আর কাজ কি, পালা এবার সাঙ্গ হবে, কত ধানে কত চাল ব্যাটারা এবার বুঝবি। আরে গান্ধীভক্ত মানুষ সরল সোজা, তাকে নিয়ে এত ব্যঙ্গ—

হেরম্ব বলত, এই হলগে রাজনীতি—এক বেগুনেই দেশটাতে কি বিপ্লব শুরু হয় দেখবে ঝর্ণা। এটা বিপ্লব!

আজ্ঞে ঝর্ণাদেবী। শিগগিরই ক্ষমতায় এলুম বলে।

তা এ-রাজ্যে ক্ষমতায় এল ঠিক, সেতো অনেক পরেকার কথা—কিন্তু এমন একটি নির্জন মাঠে, স্কুলের কোথাও কীর্তনের মতো সুর ধরে কারা গান করছে। সেই একই গান—পরেছি বেগুনের মালা, ভাত খেয়ে আর কাজ কি—কি প্রচারের মহিমা—গোয়েবেল না কে যেন, হিটলার সাব যাঁর দৌলতে এত বড় একটা মহাযুদ্ধ বাধিয়ে দিল—হাজার হাজার কামান, যুদ্ধ জাহাজ, যুদ্ধ বিমান—আর মার্চ-পাস্টের দৃশ্য খবরের কাগজে, ঝর্ণা দেখেছে—হেরম্ব যে নাকি চাপরাশির কাজের উপযুক্ত নয়, স্কুলের ব্যাক ব্যাঞ্চার, সে নাকি লোকাল কমিটির নেতা হতে যাচ্ছে।

খবরটা দিলে হেরম্ব খুশিই হবে।

আর তখনই দেখল ঝর্ণা, দুই অস্থি চর্মসার নারী স্তূপাকার টেবিল বেঞ্চির ফাঁক দিয়ে ঠেলে ঠুলে বাইরে বের হয়ে আসছে।

পরনে ছেঁড়া ত্যানাকানি। চুল উসখো খুসকো—পাগল প্রায় চোখমুখ। কংকালসার চেহারা।

মুখে হাতে পায়ে কতকালের স্যাঁতলা গজিয়ে গেছে যেন।

চেঁচাচ্ছে—পাশে গণআদালত চলছে—চুপ কী সুন্দর সুপুরুষ তরুণকে হত্যা করা হবে। গলা কেটে দেবে বলছে। মিহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, মরে গেছে।

ঝর্ণা বলল, না। মরে যায়নি।

কী হয়েছে!

কি দুর্গন্ধ শরীরে।

ঝর্ণা বলল, কিছুই হয়নি। সে মুখে শাড়ি চাঁপা দিয়ে কথা বলছে। দুর্গন্ধে বমি পাচ্ছে ঝর্ণার।

তারপরই বিড় বিড় করে বকছে।

কি বকছে, ঝর্ণা বুঝতে পারছেনা।

এরা যে ফুটপাথের ভিক্ষাজীবী মানুষ, দুই নারী—ফুটপাথে শুয়ে থাকতে দেখা যায়—ছেঁড়া তেনাকানি—সম্বল, টুটা ফাটা ভারতবর্ষের প্রতীক, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জন্যই এরা এই পরিত্যক্ত আবাসে আশ্রয় নিয়েছে— গণ আদালতের আতঙ্কে এরাও ছুটে পালাবার সময় শুধু বলল, দিদি পালান—আপনাকেও ধরতে পারে। একটা যাও ডেরা ছিল, তাও গেল দিদি। আমরা যে কোথায় যাই!

এই এই, আরে শুনতে পাচ্ছেন, আমি এবার মরে যাব—মিহিরের বুকে

মুখ রেখে হাহাকার কান্না, কে কাঁদে মিহির যেন দূরবর্তী এক কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কার কান্না—

আর তখনই মিহির ধরফর করে উঠে বসল, সদ্য ঘুম থেকে উঠলে যেমন হয়, হাই তুলছে—অচেনা জায়গায় সে আছে—ঝড় এবং এই মহিলাকে সে চেনে—তবে কোথায় নিয়ে এসে উঠল বুঝছে না।

কী হয়েছে। কান্নার কি হল। বৃষ্টি থেমেছে দেখছি। ঝড়ও নেই—চলুন হাঁটি। রাত আর বেশি বাকি নেই।

চুপ, ফিস ফিস করে বলছে ঝর্ণা। পাশের ঘরে গণআদালত। পাঁচসাতজন ছেলে একটা ছেলেকে ধরে এনেছে। খুন করবে। গলা কেটে দেবে।

ও নকশাল! বাদ দাও। ওরা আমাদের গায়ে হাত দেবে না। স্বপ্ন দেখে। দেশে কোন শোষণ নেই। মানুষ সব হিতৈষি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝর্ণা দেবি ও হয় না। মানুষ আত্মপর। সে সর্বগ্রাসী। আচ্ছা আমার কি হয়েছিল?

জানি না।

এতক্ষণ আগুন জ্বলছিল—সেই আগুন এই মাত্র নিভে গেল। আবার সেই ঘোর অন্ধকার। ঝর্ণা পাশে বসে বলছিল, মিহির আপনি যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন? আপনাকে ফিরে পাব আশাই করতে পারিনি। দুঃচিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, প্লিজ দয়া করে আর ভিরমি খাবেন না। দোহাই আপনার ঈশ্বরের।